রামরঞ্জন দাস

পশ্চিম বঙ্গের রূপ ও রেখা

ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ

পশ্চিমবঙ্গের রূপ ও রেখা

রামরঞ্জন দাস
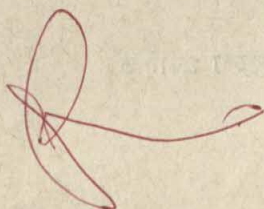
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৮৩

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব

ডক্টর কল্যাণ কুমার

গঙ্গোপাধ্যায়ের

চরণকমলে—

মুখবন্ধ

আমরা 'ইতিহাসবিমুখ আত্মবিস্মৃত জাতি' এই কথাটি আগে যেমন ঘন ঘন উচ্চারিত হোত, এখন আর তেমন হয় না, কারণ পরবর্ত্তী যুগে কয়েকজন মনস্বী দেশ ও জাতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করে গেছেন। বাঙালীর ইতিহাস বাঙালীর গর্ব। সে ইতিহাস নিয়ে দেশবরেণ্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার অন্ত নেই। যতই গবেষণা চলে, ততই তার বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, ইতিহাসের ছাত্রদের মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে সে ধরনের কৌতূহল হওয়াটা খুব একটা বিস্ময়ের বস্তু নয়। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে বিচিত্র অভিব্যক্তি, ভিন্ন আচার ও ব্যবহার, জীবন ধারণ ধরন, সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণে সার্থক আজ যে পশ্চিমবঙ্গ, তাকে জানার বা বোঝার ইচ্ছা কার না আছে? 'পশ্চিমবঙ্গের রূপ ও রেখা' এই ধরনের প্রচেষ্টার এক ফলশ্রুতি। জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমাকে ঈদৃশ গ্রন্থরচনায় প্ররোচিত করেছে।

ইতিপূর্ব্বে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্যসহ বাংলাদেশের যে অমর ইতিহাস রচনা করে গেছেন তা তুলনাবিহীন। গবেষক ছাত্রদের কাছে তার মূল্য যে অপরিসীম তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বসাধারণের কাছে তুলে দিলাম 'পশ্চিমবঙ্গের রূপ ও রেখা'। আশা রাখি, এই গ্রন্থটি পাঠকগণের কিছুটা তৃষ্ণা নিবারণ করবে। অন্তত এটুকু আত্মপ্রসাদ লাভ করবে এই জেনে যে একদিন বাঙালী কি ছিল, কি তাদের ধ্যানধারণা, তাদের বিচিত্র সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, জীবন যাপন প্রণালী। আর আজ ঘাত-প্রতিঘাতে, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত বাঙালীর কি দশা— হতাশার মধ্যে চরমতৃপ্তি এইখানেই।

মৎপ্রণীত "পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্ত্তি" গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক পুরাকীর্ত্তির বিস্তৃত আলোচনা করার সময় কিছু কিছু রাজনৈতিক পটভূমিকার অবতারণা করেছিলাম। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমি পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, জনপ্রকৃতি, শিল্প ও উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতির কথা সঠিকভাবে উপস্থাপনা করবার চেষ্টা

করেছি। উপস্থাপনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক কারণেই দুই বঙ্গের অবতারণা করলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। তবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি থাকাটা অসম্ভব নয়। সেজন্য পাঠকগণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টায় রইলাম।

সরকারী অনুদান বইখানি প্রকাশনায় সহায়তা করেছে। সেই সঙ্গে ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিমিটেড প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। প্রকাশনার কাজে যিনি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার স্ত্রী। তাঁর অনুপ্রেরণা না থাকলে হয়তো বইখানি দ্রুত সমাধা হোত না। এঁদের সকলেরই কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—রামরঞ্জন দাস

সূচীপত্র

ভূ-প্রকৃতি

বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব্বে বঙ্গ ও রাঢ় নামে অভিহিত হোত। জাতিতত্ববিশারদগণ মনে করেন যে যাযাবর বঙ্গ ও রাঢ় নামক অনার্য্য-জাতিদের নাম থেকেই বঙ্গ ও রাঢ় নামের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকালে বঙ্গ বলতে কেবল পূর্ব্ববঙ্গ বোঝাত। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে ঐ যাযাবর বঙ্গ-জাতি আর্য্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে গিয়ে বসবাস করতে থাকে এবং অনুরূপভাবে রাঢ়-অনার্য্যজাতি পশ্চিমবঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় জাতির বসবাসের জন্য তাদের নামানুসারে পশ্চিমবঙ্গের নাম রাঢ় হয়েছিল। রাঢ় শব্দ সংস্কৃত রাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত রাঢ় শব্দ প্রাকৃতে লাড় হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে রাঢ় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দী, গুজরাটী, মৈথিলী ও মারাঠী ভাষাতে রাঢ় শব্দের অর্থ অসভ্য বা নীচ। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে এর অর্থ অস্পৃশ্য। তবে ধ্বনিগত দিক থেকে অনেকগুলি অর্থ হয়। যেমন লার= সূতো, লাড়=সাপ, রাঢ়=সুর। শেষ অর্থটি অষ্ট্রিক এবং জৈন ও গ্রীকরা তা গ্রহণ করেন। কিন্তু নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় (বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ) রাঢ় শব্দ যে সংস্কৃত মূলক নয় তা লিখে গেছেন। তাঁর মতে সাঁওতালী ভাষায় রাঢ়রা নামক একটি শব্দ আছে এবং তার অর্থ—নদী গর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরিয়া জমি। এই সাঁওতাল বা দেশ্যশব্দ থেকে রাঢ় শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধহয় সর্বপ্রথম এই বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় 'বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ'। বোধহয় কর্মসূত্রে বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতে দেখা যায় ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কোন নদী তীরবর্ত্তী পুণ্ড্র রাজাকে পরাজিত করেন এবং পর পর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুহ্মরাজাদের পরাজিত করেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বে বঙ্গ জনপদকে অঙ্গ-কলিঙ্গ পুণ্ড্র এবং সুহ্ম জনপদের সঙ্গে উল্লেখ করতে দেখা যায়। মহাভারতের রচনা কালে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে এবং এর আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পর্ব্বেই বঙ্গ ও সুহ্মের উল্লেখ আছে। হরিবংশে ৩১ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। দৈত্যরাজ কলিঙ্গরাজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এঁদের নামানুসারে পরবর্ত্তীকালে

অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, পুণ্ড্রদেশ, কলিঙ্গদেশ ও সুহ্মদেশ—এই পাঁচটি দেশ বা রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল।

"অঙ্গোবঙ্গ, কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মঃশ্চতে মুক্তাঃ
তেষাং দেশাঃ সমখ্যাতা স্বনাম কথিতা ভুবি।"
(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪।৫০)

অঙ্গ :—বর্ত্তমান ভাগলপুর, সাঁওতালপরগণা, ধানবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ (ভাগলপুর অঞ্চল)

বঙ্গ :—বর্ত্তমানকালের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গকে রাঢ় ও উত্তরবঙ্গকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পরে বরেন্দ্র বলা হোত। বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। বৈদিকযুগ থেকে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠানযুগে বঙ্গ ছিল নিত্য পরিবর্ত্তনশীল্। মোগলগণ বঙ্গকে গৌড়ের সঙ্গে একত্রীভূত করে সুবা বাংলার সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সময় থেকেই বাংলা নামটি প্রচলিত হয়ে আসছে। (পূর্ব্ববঙ্গ)

কলিঙ্গ—উত্তরে সুবর্ণরেখা ও দক্ষিণে গোদাবরী নদী এর সীমা। পৌরাণিক যুগের কলিঙ্গ ঐতিহাসিক যুগে কোন এক সময় উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ এই দুই জনপদে পরিণত হয়। (কটক অঞ্চল)

পুণ্ড্র—বর্ত্তমান রাজসাহী, ঢাকা, দিনাজপুর সন্নিহিত অঞ্চল এবং মালদহের পূর্ব্ব অঞ্চল অর্থাৎ মালদহ থেকে বগুড়া পর্য্যন্ত ভূভাগ নিয়ে পুণ্ড্ররাজ্য গঠিত ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড়, পূর্ণভবা তীরবর্ত্তী দেবকোট এবং করতোয়া তীরবর্ত্তী মহাস্থান—এই তিনটি প্রধান নগর ছিল। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীমণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল গৌড়। (মালদহ অঞ্চল)

রাঢ় বা সুহ্ম—সুবর্ণরেখার উত্তরে ছিল সুহ্মরাজ্যের অবস্থান। পূর্ব্বদিকে বঙ্গ, পশ্চিমে মগধ এবং উত্তরে অঙ্গরাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। বর্ত্তমান মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চল এই ভূ-ভাগের অন্তর্গত ছিল। সুহ্মের নিকটবর্ত্তী স্থানকে প্রসুহ্ম বলা হোত। রাঢ় অঞ্চলের পূর্ব্ব নাম—অঙ্গ, পুণ্ড্র, এবং সুহ্ম পরবর্ত্তীকালে গৌড়মণ্ডল নামে অভিহিত হয়। এক সময় সমস্ত বাংলা দেশ গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। আসাম পর্যন্ত সীমা ছিল এই গৌড়বঙ্গের।

মহাভারতে (সভাপর্ব্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য অর্জুন, ভীম, নকুল, সহোদেব উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম জয় করেছিলেন। ভীম পূর্ব্বদিকে বহু রাজ্য জয় করে জনককে পরাজিত করেন। বিদেহ রাজ্যের কাছে শক ও বর্ব্বর এবং দূরে কিরাতরা বাস করত। তাদের বশ করে স্বপক্ষীয় সুহ্ম ও প্রসুহ্মদের নিয়ে, মগধ রাজ জরাসন্ধপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি কর্ণকে ও পর্ব্বতবাসীদের পরাজিত করেন। সেখান থেকে মোদাগিরি, তারপর মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকী কচ্ছবাসী রাজা মনোজিৎ, বঙ্গরাজ—সমুদ্র সেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত কর্বট ও মহাসাগর তীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছবাসীদের জয় করেন। মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন ভৌগলিক চিত্রটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বিদেহ রাজ্যের উত্তর সীমা গণ্ডকী এখনকার দ্বারভাঙ্গা (দ্বার-বঙ্গ) জেলা। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করত। এই শক আর বিদেশী শকজাতি অভিন্ন নয়। যে শকজাতি বিদেহ রাজ্যের উত্তরে বাস করত গৌতম বুদ্ধ সেই শক জাতীয়। দূরে কিরাতরা বাস করত; কিরাতরাই ইন্দোমঙ্গোলীয়, শকেরা তাদের শাখা। সুহ্মদেশের আগে যে দেশ তার নাম প্রসুহ্ম। ভাগীরথীর পশ্চিমের মুর্শিদাবাদ ও প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশ সুহ্মদেশ। তার আগে বা দক্ষিণে প্রসুহ্ম। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পূর্ব্বে পুর্ণিয়া জেলা। পুণ্ড্রদেশের আরম্ভ এখান থেকে। পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ, সমুদ্র সেন সমুদ্রপতি, পরে সমুদ্রের নাম সমতট বা সমুদ্রের তট অঞ্চল হয়েছে। তাম্রলিপ্ত—তমলুক এবং কর্বট দেশ বোধ হয় বঙ্গের দক্ষিণে। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল (অর্থাৎ যে সমুদ্রতটে বাঘ বাস করে) সুন্দরবন হওয়াই স্বাভাবিক। মোটামুটিভাবে মহাভারতীয় যুগে আমরা বঙ্গ, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ পাই। তাতে বলা হয়েছে যে অসুররাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।

প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ় দেশই হোল পশ্চিমবঙ্গ। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে (খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক) লাঢ় বা রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বর্ণনা আছে যে তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান স্বামী ওরফে মহাবীর স্বামী রাঢ় দেশে বারো বৎসরকাল যাপন করে বন্যজাতির মধ্যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে 'লার' নামে, নবম শতাব্দীতে ধর্মপালের

সংস্কৃত তাম্রশাসনে 'লাট' নামে এবং একাদশ শতাব্দীতে তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপিতে 'লাড়' নামে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন সময়ের—লার, লাট, লাড় এবং রাঢ় সমার্থক। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে সুহ্ম—রাঢ় অর্থাৎ সুহ্মই রাঢ়দেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশ অর্থাৎ যে স্থানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হয়েছে সেখান থেকে বর্ত্তমান হাওড়া জেলা পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিমাংশ সুহ্ম বা রাঢ় নামে প্রখ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রচিত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে যে সুহ্মদেশ সেই সময়ে সমুদ্রোপকুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শশাঙ্ক এই শতাব্দীতে সুহ্মদেশ নিজের রাজ্যভূক্ত করেন এবং মধ্যভাগে সুহ্মরাজ্য শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনের রাজ্যভূক্ত হয়। এই সময়ে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলা দেশ তখন ছটি বিভাগে বিভক্ত ছিল বলে জানা যায়।

(১) চম্পা—ভাগলপুর জেলা
(২) কাজঙ্গলা—সাঁওতাল পরগণার উত্তরপূর্ব সীমা; রাজমহলের চারিদিকের অংশ নিয়ে অবস্থিত।
(৩) পুণ্ড্রবর্দ্ধন—মালদহের কতকাংশ এবং রাজসাহী ও বগুড়াজেলা।
(৪) সমতট—যশোহরের কিয়দংশ, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলা।
(৫) তাম্রলিপ্ত—চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।
(৬) কর্ণসুবর্ণ—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশ ও মধ্যভাগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা।

প্রাচীনকালে আধুনিক বাংলাদেশের সীমা কিরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল তা বর্ত্তমানে সঠিক বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর ঠিক হয়েছিল বর্ত্তমান হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলাগুলি প্রাচীনকালে সুহ্মরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

মহাভারত ছাড়াও বহু পুরাণ—মৎস্যপুরাণ, মার্কেণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাঁচটি রাজ্যের নাম একত্রে দেখা যায়। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উক্ত জনপদগুলির যে সীমা নির্দ্দেশ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে বর্ত্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর বিভাগের সন্নিহিত অঞ্চল প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্ব্বে প্রদেশটি বঙ্গরাজ্য নামে

প্রখ্যাত ছিল। কানিংহাম, উইলসন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ স্থির করেছেন যে বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমদিকের ভূমিখণ্ড অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাংশ পরবর্ত্তীকালে পুণ্ড্রাজ্য নামে অভিহিত হয়েছিল এবং কলিঙ্গরাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশ নিয়ে সুহ্মরাজ্য গঠিত হয়েছিল।

বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে আরও বলা হয়েছে যে গঙ্গা নদী অন্যান্য দেশ ছাড়াও মগধ, অঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এই সব আর্য্যজনপদ পবিত্র করে বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণে সাগরে মিলিত হয়েছে। এখানে বিন্ধ্যাচলকে পূর্ব্ব সীমা ধরা হয়েছে। যখন যবন ও হূণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্ব্বত্য-দেশে বাস করত তখন পূর্ব্বদিকে ছিল মগধ, বিদেহ, ব্রহ্মোত্তর, পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), প্রাগ্জ্যোতিষপুর (আসাম), প্রবঙ্গ-বঙ্গেয় (দক্ষিণবঙ্গ), মালদ (মালদহ)। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে যে বৈতরণী নদী বিন্ধ্যপাদ থেকে প্রসৃত। উৎকল এই নদীর উৎস দেশ, কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশ, অর্থাৎ প্রাচীনকালে ছোটনাগ-পুরের দক্ষিণ দেশকে বলা হোত কলিঙ্গ, পরে কলিঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব ভাগের নাম হয় উৎকল। উত্তর কলিঙ্গ থেকে উৎকল। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সুহ্ম দিয়ে কপিলা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কপিলা নদীকে কংসাবতী বা কাঁসাই বলা হয়েছে। কিন্তু সুবর্ণরেখাও হতে পারে। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয় রঘু বঙ্গ থেকে সুহ্মে ফিরে এসে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত এবং সুহ্মের সংলগ্ন দেশ এবং প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্র একথা অনুমান করাটা বোধ হয় অন্যায় হবে না। তবে কোথাও কোথাও তাম্রলিপ্তকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দেশ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গের উল্লেখ গণ্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ডা (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক) শিলালিপিতে, রাজাচন্দ্রের (চতুর্থ শতক) মেহরালি স্তম্ভলিপিতে এবং বাদামীর চালুক্যরাজ পুলকেশীর (সপ্তম শতক) মহাকূট স্তম্ভলিপিতে পাওয়া যায়। তবে এদের একটিতেও বঙ্গের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করে না; এবং কালিদাসের রঘুবংশ (চতুর্থ সর্গ) এই নির্দ্দেশ অনেকটা স্পষ্ট। বাল্মীকির রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে রচিত হয়েছিল। এতেও বঙ্গ ও সুহ্মের যে উল্লেখ আছে তাতে বঙ্গ ও সুহ্মকে ছোট জাতি বলে মনে হয় না। কারণ ছোট জাতি হলে বিদেহ, মলয়, কাশী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির সঙ্গে সুহ্ম ও বঙ্গের নাম কখনই উল্লিখিত হোত না।

সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মলযান কাশীকোশলান।
মগধান দন্ত কুলাংশ্চ বঙ্গানউগাংস্তথৈচ ॥

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ অঃ ২৫ শ্লোক)

বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে বাংলার দুটি রাষ্ট্রের কথা জানা যায়। তার মধ্যে একটি শিবিরাজ্য (বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল); রাজধানী ছিল জেতুওর-নগর।

সিংহল দেশের দীপবংশ ও মহাবংশ দুটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে বিজয় সিংহ নামে এক রাজা অত্যাচার করতঃ সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে সিংহলে যান এবং সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (৩২৫ খৃষ্টপূর্ব্ব) বাংলায় গঙ্গারিডি নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি ছিল যাদের শৌর্য্যবীর্য্য আলেকজাণ্ডারের মত বীর পুরুষকেও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য করেছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই সময় গঙ্গারিডি এদেশে রাজত্ব করতেন এবং তারা নাকি শৌর্য্য ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। যে সকল রাজা ও রাজবংশ বাংলায় তথা তার পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন, তাঁদের কেউই বাঙ্গালী ছিলেন না। সকলেই দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন। এর পরবর্ত্তী ইতিহাস কিন্তু অন্ধকারময়। গ্রীক লেখকেরা পূর্ব্বভারতের দু'টি দেশের উল্লেখ করেছেন—গঙ্গারিডি ও প্রাসী। প্রাসী হোল প্রাচী বা প্রাচ্যদেশ। গঙ্গারিডি নাম মনে হয় সংস্কৃত 'গঙ্গারাষ্ট্র' 'গঙ্গারাঢ়া,' বা 'গঙ্গাহৃদয়' নামের গ্রীক বিকৃতি। গঙ্গারিডি ও প্রাচী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ তাদের রাষ্ট্রিক ও জন-পদস্বতন্ত্র তখন অনস্বীকার্য্য ছিল না। মগধের মৌর্য রাজারা গঙ্গারিডি ও প্রাচী, উভয়রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ভৌগলিক বিশেষজ্ঞ টলেমি বলেছেন যে গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বসবাস ছিল এবং তাদের রাজধানীর নাম ছিল গঙ্গী এবং গঙ্গানগর বলে মনে হয় কোন নগর ছিল। দক্ষিণ বঙ্গের বদ্বীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দেই তাদের নিজেদের রাজধানী গঙ্গানগরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার যে নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন তাতে তার ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। মনে হয়, বর্ত্তমান গঙ্গাসাগর বা গঙ্গাসাগরের সঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের আগেই গঙ্গাসাগর তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা বিবরণে

গঙ্গাসাগরকে বিখ্যাত তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও ভৌগলিক অবনতির ফলে গঙ্গাসাগর যাত্রা ক্রমে বিঘ্নবহুল হয়ে উঠে এবং সমুদ্রের ভাঙ্গা-গড়ায় গঙ্গানগরও ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৪১-৪২ সাল পর্য্যন্ত গঙ্গাসাগরে যে প্রাচীন দু'একটি দেবালয় ও অন্যান্য নিদর্শন ছিল, তাও পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

পাণিনিসূত্রে গৌড়পুর নামক একস্থানের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই গৌড়পুর বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কোনও স্থান ছিল কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে একটি দক্ষিণী শিলালিপিতে রাঢ় দেশকে গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্যপুরাণে, বৃহৎ সংহিতায়, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় গৌড়দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মোটামুটি তার অবস্থানেরও একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এই জনপদের আদিকেন্দ্র এবং পরে মালদহ এবং বোধহয় বর্ধমান এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে আদি গুপ্তবংশের পর আর একটা ঐ নামের বংশ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছিল। এই রাজ্যের নাম ছিল গৌড়। উত্তর ভারতের রাজগণ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মৌর্য্যকুষাণগণ বাংলা দেশে প্রভুত্ব করেছেন। ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমদিকে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, ও সমাচারদেব নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। এঁদের পর ৬০৬ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক বাংলায় তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান বহরমপুরের কাছে কর্ণসুবর্ণ তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি উৎকল, দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর) ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ জয় করেছিলেন। শশাঙ্কের পর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত আবার অন্ধকার যুগ। এই কালের শেষে দীর্ঘ অরাজকতা বাসা বেঁধেছিল। এবং এই অবস্থাতেই প্রজাগণ একজনকে রাজপদে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর নাম গোপাল—বিখ্যাত পালরাজগণের আদিপুরুষ। যদিও ধর্মপাল ও দেবপাল বঙ্গরাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন তথাপি তারা কিন্তু মগধের রাজা। বঙ্গদেশ জয় করে বহুকাল শাসন করেছিলেন এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে পালবংশের এই চারশো বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের গৌরবময় কাল। পালরাজগণের এ দীর্ঘ শাসনকালের শেষভাগে যে সব রাজা ও রাজ্যের সংবাদ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে তদানীন্তন বাংলারাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমভাগে পালরাজ্যের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ ছিল এবং পূর্ব্ব দক্ষিণভাগে বাংলাদেশের সেই চিরন্তন শাসন

পদ্ধতিই চলছিল। অর্থাৎ বাংলার অধিকাংশ অংশে ছোট বা বড় ভূঁইয়া রাজারা রাজত্ব করতেন এবং এঁরা সম্রাটের নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করতেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ভূঁইয়া রাজবহুল বাংলা দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) এবং বঙ্গাল (দক্ষিণবঙ্গ) দেশে রাজত্ব করতেন। উত্তর ও পশ্চিম অংশে চন্দ্রবংশীয় এবং অঙ্গ ও মগধে পালরাজগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় সেনরাজগণের অভ্যুদয় হয়। সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য বাংলাকে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন। এই সেনবংশের রাজধানী কোথায় ছিল এই নিয়ে বাগ্ বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন বিক্রমপুর আবার কেউ বলেন নদীয়া বা নবদ্বীপে। গৌড়ে যে তাদের রাজধানী ছিল না একথা একবাক্যে বলা যায়, কেন না বল্লালসেন নিজেই গৌড় বিজয় করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াকেই সেনরাজাদের রাজধানী বলে অভিহিত করেছেন, তার কারণ বক্তিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেই বাংলার রাজাকে উৎখাত করে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মুসলমান যুগের প্রারম্ভে মালদহ জেলার লক্ষণাবতী গৌড় নামে অভিহিত হোত। পালরাজগণের উপাধি ছিল গৌড়েশ্বর। সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সাম্রাজ্য থেকেই এই সময় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম ত্যাগ করে গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল অথচ পুণ্ড্রবর্দ্ধন একটি বৃহৎ ও সুসমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় ব্যতীত বাংলার বাকি সমস্ত অংশই তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদিকে গৌড় নামে যত বড় রাজ্যই হোক এবং তাতে বরেন্দ্র যুক্ত হলেও পূর্ব্ব বাংলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। গৌড় পরবর্ত্তীকালে আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ উন্নততর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গৌরব দাবী করেছিল এবং তারজন্য ঐ বঙ্গ থেকে পৃথক এবং রাঢ় ও বরেন্দ্রী মিলিত একটা বিস্তৃত দেশ বা রাজ্য ঐ নামে করে নিয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ গ্রন্থ তাকবৎ-ই-নাসরিতে লিখেছেন যে গঙ্গার দু'ধারে লক্ষণাবতী রাজ্যের দু'টি পক্ষ—গঙ্গার পশ্চিমদিকে রাল (অর্থাৎ রাঢ়), এই ধারেই লখনোর নগরী ; এবং পশ্চিম বরিন্দ (অর্থাৎ বরেন্দ্র) নামে খ্যাত। এই ধারেই দেবকোটনগর অবস্থিত। তিনি আরো লিখেছেন যে তৎকালে লক্ষণাবতী ও তার চারিদিকে যাজনগর (যাজপুর বা উৎকলের উত্তরাংশ) বঙ্গ

কামরূপ ও ত্রিহূত (মিথিলা) এবং এই সব দেশ একত্রে গৌড় নামে খ্যাত ছিল। কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। পূর্ব্বে দিনাজপুর অঞ্চলকে জ্যোতিষ দেশ বলা হোত। তার পূর্ব্বদিকে এর অবস্থান বলে এই প্রদেশের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে রাজা বল্লালসেনের সময় বর্ত্তমান বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ ছিল (বিশ্বকোষ, ষোড়শভাগ)।

৯৬৭ খৃষ্টাব্দের একটি দক্ষিণা শিলালিপিতে বরেন্দ্রভূমির উল্লেখ দেখা যায়। সেনরাজাদের শিলালিপি থেকে এ অনুমান নিঃসংশয়ে করা যায় যে বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী জেলা এবং পাবনার কিছু অংশ এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। সিংহলী শিলালিপিতে প্রথমবার যে দেশের কথা উল্লিখিত হয়েছিল নবম ও দশম শতকে সেই দেশের দু'টি বিভাগ খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (১) দক্ষিণ রাঢ় ও (২) উত্তর রাঢ়—প্রাচীনতর কালের ব্রহ্মভূমি ও সুহ্মভূমি। বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলী এবং বর্দ্ধমানের কিয়দংশ দক্ষিণ রাঢ়ের এবং বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার অধিকাংশ উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাল ও সেন আমলে এই দুটি রাঢ় ছাড়াও দশভুক্তি ও পশ্চিম ঘাটিকার উল্লেখ দেখা যায়। বর্ত্তমান মেদিনীপুর দশভুক্তির এবং হাওড়া জেলা ও গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী অঞ্চল পশ্চিম ঘাটিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন হিন্দুযুগে সমস্ত বাংলাদেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে অভিহিত হোত। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র ; পশ্চিমে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত ; দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে প্রচলিত ছিল। পাল আমলের শেষের দিকে বঙ্গের দু'টি ভাগ দেখা যায়। বিক্রমপুর সহ ঢাকা ফরিদপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল অনুত্তর অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ। এই যুগে দক্ষিণবঙ্গ সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেন মেঘমালায় উল্লিখিত নাব্য নামক বিভাগটি এই দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে হয়। এই সমস্ত দেশের সীমা ও বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায় না। নদনদীর গতিপ্রবাহ ব্যতীত অন্যপ্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চল যে এককালে সুসমৃদ্ধ ঘনবতিসপূর্ণ লোকালয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং নদনদীর মত বাংলার স্থলভাগও হিন্দুযুগে এখনকার অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল। প্রাচীনকালে বঙ্গ ও বঙ্গাল

দু'টি পৃথক দেশ ছিল। প্রাচীন বঙ্গালদেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন। অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগে গৌড় ও বঙ্গ এই দু'টি সমগ্র বাংলা দেশের সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুযুগে এরা বাংলা দেশের অংশ বিশেষকে বোঝাত। সমগ্রদেশের নামস্বরূপ ব্যবহার হয় নি। হিন্দুযুগের শেষ ভাগে বাংলা দেশ গৌড় ও বঙ্গ প্রধানতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মুসলমানযুগের শেষভাগে গৌড়দেশ সমস্ত বাংলা দেশকেই বোঝাত। হিন্দুযুগ অর্থে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ বাঙালী বলে একটি পৃথক জাতির স্পষ্ট অভ্যুদয় যখন হয় নি, তখন বাংলার জনপদগুলিতে যারা বসবাস করত তাদের ভাষা, আচার, ও সামাজিক জীবনের কোন একতাবন্ধন বা আদর্শগত ঐক্য দেখা দেয় নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই একত্ব দানা বাঁধার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং তা প্রাচীন যুগকে অতিক্রম করে যখন মধ্যযুগে এলো তখনও এই একত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশলাভ ঘটেনি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন একত্বলাভ করল তখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম প্রত্যাহার করে বাংলা দেশ নামে অভিহিত হোল।

'আইন-ই-আকবরী' প্রণেতা আবুল ফজল লিখেছেন 'বঙ্গলা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র। পুরাকালে এতদ্ অঞ্চলের রাজন্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ উর্দ্ধ ও বিশগজ আয়ত একটি 'আল' অর্থাৎ মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ + আল এই দুই শব্দের যোগে বঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে'। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী শিলালিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি জনপদের উল্লেখ একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। এ অনুমান স্বাভাবিক যে বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে 'তারিখ-ই-ফিরুজসাহী' গ্রন্থেও দুই জনপদকে পৃথক পৃথক বলে গণ্য করা হয়েছে। মাণিকচন্দ্র রাজার 'ভাটি হইতে আইল বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি' গানে এই কথাটি অনুমিত হয় যে 'ভাটি' ও বঙ্গাল দেশ একসময়ে প্রায় সমার্থক ছিল এবং বঙ্গালদেশের অবস্থান মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান পূর্ববঙ্গে ছিল বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। দেখা যায়, প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক পর্য্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, ব্রহ্ম, তাম্রলিপ্ত, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। বিরোধ-মিলনে কখনও কখনও স্বতন্ত্র জনপদগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তা স্থিতিশীল হয়নি। এই শতক থেকেই মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে

একেবারে উৎকল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড গৌড় নামে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শশাঙ্ক এই গৌড়ের রাজপদে আসীন হয়ে তার পূর্ণ পরিণতি ঘটায়। নূতন নূতন বিভাগীয় নামের যে উদ্ভব ঘটেছিল যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্রী, দণ্ডভুক্তিতে তাম্রলিপ্ত, পশ্চিমে বাংলা অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় ইত্যাদি ধীরে ধীরে নিজেদের সত্বা হারিয়ে গৌড়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। পুণ্ড্র বরেন্দ্রী সম্বন্ধেও এই এক কথাই প্রযোজ্য। সেন আমল পর্যান্তই নিজের সত্বা ধরে রেখেছিল কিন্তু তারপর গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। গৌড় নাম নিয়ে বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক করেছিলেন পাল ও সেন আমলেও তা সার্থক হয়নি। সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটল বঙ্গনামের—যে বঙ্গ ছিল আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত এবং যে বঙ্গ পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরবের ও আদরের। সমগ্র বাংলা দেশের বঙ্গ নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলেও ঘটে নি। সেন আমলের সময়েই বাংলা দেশ পাঠানদের হাতে চলে যায় (১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ)। যে ঐক্য এতদিন দানা বাঁধে নি, তা ঘটল তথাকথিত পাঠান আমলে। তাঁদের পঞ্চাশ বছরের রাজত্বের পর সম্রাট আকবরের সময় (১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ) বাংলা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এবং সমস্ত বাংলা দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যদিও বর্ত্তমান বাংলা সেদিনের বাংলা অপেক্ষা অনেক ছোট। তার কারণ প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্র-সীমা সকল সময় এক হয় না বা থাকে না। বিভিন্ন সময়ে জনপদ বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হয় বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে। বাংলা দেশের ভাগ্যে তা-ই ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে যেঘটবে না তা জোর করে বলার উপায় নেই।

মুসলমানযুগেই সর্বপ্রথম পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি দেশ একত্রে বাংলা অথবা বাউল নামে পরিচিত হয়। এই বাংলা থেকেই ইউরোপীয় বেংগলা ও বেঙ্গল নামের উৎপত্তি। হিন্দুযুগে বাংলা দেশের কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা ছিল না, তবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল এবং সেইভাবেই পরিচিতি লাভ করেছিল।

ভৌগলিক ঐক্য প্রাচীনযুগে ছিল না। ছিল বিভিন্ন অঞ্চল—উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে ছিল বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বংগাল। এছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের খানিকটা নিয়ে ছোট গৌড়। ভাষার সামঞ্জস্য থাকলেও কোন একটি ভাষা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না।

গুপ্তযুগে বঙ্গের একাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের পশ্চিম সীমার সঙ্কোচ ঘটে। সপ্তোত্তর যুগে বর্দ্ধমানভুক্তির সৃষ্টি হয়। মোটামুটি এই বর্দ্ধমানভুক্তি একালের বর্দ্ধমান বিভাগের সঙ্গে অভিন্ন। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য পালবংশীয় রাজাগণ তাদের সাম্রাজ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন—শ্রীনগরভুক্তি (বিহার), তীরভুক্তি (ত্রিহুত) ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি (বঙ্গদেশ)। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যখন অন্যান্য স্থান হারিয়ে শুধুমাত্র বঙ্গদেশ শাসন করছিলেন সেই সময় তাঁরা বাংলাকে তিনটি ভুক্তিতে বিভক্ত করেছিলেন। যথা—বর্দ্ধমানভুক্তি, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। উত্তরকালে কোন সময় গৌড়বঙ্গ চারটি প্রদেশ বা ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি এবং দণ্ডভুক্তি—মালদহ, আসাম, রাঢ় অঞ্চল এবং মেদিনীপুর অঞ্চল। পরে বর্দ্ধমানভুক্তির অর্থাৎ রাঢ়ের একাংশের নাম হয় কঙ্কগ্রামভুক্তি। বর্দ্ধমানভুক্তি উত্তরে অজয়, পূর্বে ভাগীরথী নদী ও দক্ষিণে সুবর্ণ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিমসীমায় গভীর অরণ্য। উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ দণ্ডভুক্তিমণ্ডল বলে কথিত ছিল। সুতরাং এই অরণ্যের খানিকটা রাঢ়ে আর খানিকটা ছিল কলিঙ্গে; রাঢ়দেশ থেকে কলিঙ্গে যাবার পথও অবশ্য ছিল। সেই পথকে দণ্ড বলা হোত : বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড থেকে যেমন শাখা হয় তেমনি বড় পথের (দণ্ডের) পাশ দিয়ে শাখাপথ বেরোয়। উড়িয়্যাভাষায় এই অর্থে দাণ্ড বা দণ্ড শব্দ বহু প্রচলিত। মেদিনীপুর গড়বেতার পথ মেদিনীপুর জেলাকে দণ্ডরূপে পূর্ব ও পশ্চিমে দু ভাগে ভাগ করেছে। গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া হয়ে পথটি উত্তর পশ্চিম দিকে চলে গেছে। কিন্তু এই পথ বা এর পশ্চিমের চাইবাসা-পুরুলিয়ার পথ দিয়ে রাঢ়ে যাওয়া যেত না। উত্তর রাঢ় থেকে দণ্ডভুক্তি যাবার পথ ছিল। রাণীগঞ্জ—গঙ্গাজলঘাটি—বাঁকুড়া। কাঁকসা—সোনামুখী—বিষ্ণুপুর; বর্দ্ধমান—উচালন—শ্যামবাজার—গড়বেতা এবং বর্দ্ধমান—উচালন—শ্যামবাজার—ক্ষীরপাই—মেদিনীপুর। এই চারটি পথের একটি ছিল আসল দণ্ডের অংশ এবং প্রাচীন দণ্ডভুক্তির মধ্যে দিয়ে দণ্ড বিসর্পিত ছিল। তার পশ্চিমে ছিল কলিঙ্গ দেশ। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধ হয় দ্বারকেশ্বর এবং দক্ষিণসীমা সুবর্ণরেখা ও সাগর ছিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমানা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত এত বড় ভুক্তি আর দ্বিতীয় ছিল না। উত্তরে

হিমালয় শিখর থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমানা ছিল। ভাগীরথী গঙ্গার পূর্বতীরের পশ্চিমবঙ্গের বিশাল অঞ্চল ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে। তারমধ্যে খাড়ি অঞ্চল অন্যতম। গঙ্গা দুভাগে খাড়িমণ্ডলকে বিভক্ত করেছিল। পূর্বতীরের নাম ছিল পূর্বখাড়ি। দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার খাড়ি নামে গ্রাম এখনও আছে। পশ্চিমতীরে ছিল পশ্চিমখাড়ি। খাড়ি শব্দই সংস্কৃতে খটিকা হয়েছে।

লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে নূতন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়—"কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃ পাদি দক্ষিণ বীথ্যাৎ উত্তরাঢ়ায়াং"। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর রাঢ়ের সঙ্গে কঙ্কগ্রামভুক্তির সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। কেউ বলেন কঙ্কগ্রাম রাজমহলের কাছে কঙ্কোজোল বা কাঁকজোল, আবার কেউ বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণে কান্দী মহকুমায় ভরতপুর থানার অধীনে কাগ্রাম-ই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম।

জনপদবিভাগের এই প্রাচীন ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে শাসনব্যবস্থা সুবিধার জন্য হিন্দুযুগেও ভৌগলিক সীমানার পরিবর্ত্তন হয়েছে। দশম শতাব্দীর ইরদা তাম্রশাসনে দেখা যায়, দণ্ডভুক্তি ছিল বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। মেদিনীপুরের দাঁতন অঞ্চলই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। পরে দণ্ডভুক্তি উৎকলভুক্তি হয়। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, সুবর্ণরেখার বহুদূর তীরবর্ত্তী অঞ্চল হয়তো বালাসোর জেলাসহ বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। একাদশ শতাব্দীতে উড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় জয় করেন। বর্দ্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অঞ্চলে কর সংগ্রহ করেন। কবি ঘনরাম লিখেছেন বর্দ্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পার হয়ে এক 'উড়ের গড়' ছিল। এরকম উড়িয়া গড় ও গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে একাধিক দেখেছি। উৎকল রাজাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সাময়িক আধিপত্য বিস্তারের সময় থেকেই মনে হয়, দণ্ডভুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বর্দ্ধমানভুক্তি থেকে। সুতরাং কেবল আভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থার জন্য নয়, অনেক সময়ে প্রতিবেশী রাজাদের কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য প্রাচীন জনপদের নাম বদল ও সীমানা বদল হয়েছে। হিন্দুযুগের ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় মুসলমান যুগের সরকার, মহল, পরগণা, চাকলা ইত্যাদি বিভাগে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রধানতঃ জলেশ্বর, মদারণ, খাতগাঁও, খালিসাবাদ, সরিফাবাদ, উদুম্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান যুগে বর্তমান জেলা বা বিভাগ হয়নি। ইংরাজ যুগে বিভাগের সীমানা বদলে

যায় এবং জেলার নামকরণ হয়। আজও আমরা ইংরাজ যুগের ভৌগলিক উত্তরাধিকার বহন করছি এবং আধুনিক যুগে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রখর হয়েছে বলে আমরা এই জেলা সীমানার সঙ্গে অনেক সময় একটা জেলাগত সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের সীমানা টানতে চাই। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরকম কোন সঙ্কীর্ণ সীমানা টানা যে ইতিহাস সম্মত নয় পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ইতিহাসের ধারাই তার সাক্ষী। পাল আমলের শেষের দিকে বঙ্গের দুটি ভাগ দেখা যায়। বিক্রমপুরসহ ঢাকা-ফরিদপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল অনুত্তরবঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ। এই সময় অনুত্তরবঙ্গ বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপরটি ছিল নাব্য বা রামাসিদ্ধিপাটক। বাখরগঞ্জ নাব্য নামেও পরিচিত ছিল। সুতরাং ঢাকা ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ একালের বাংলা দেশের এই তিন জেলা নিয়ে প্রাচীন বঙ্গের অবয়ব গঠিত হয়েছিল। চতুর্থ শতকে সমতট ও তার দুটি বিভাগ প্রবঙ্গ ও উপবঙ্গ। প্রবঙ্গ কোথায় ছিল জানা যায় না। যশোহর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে উপবঙ্গ, অর্থাৎ বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের প্রাচীন নাম। দিগ্বিজয় প্রকাশ ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে উপবঙ্গের নাম উল্লিখিত আছে। বর্তমান সুন্দরবন উপবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের আর এক নাম সমতট। সম্ভবতঃ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অংশকেই সমতট নামে অভিহিত করা হোত। নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল সমতটভুক্ত। অষ্টম, নবম শতক থেকে হরিকেল বঙ্গাল ভৌগলিক নাম হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দ্বাদশ শতকে বঙ্গ ও হরিকেল সমার্থক। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে নির্দিষ্ট ছিল এবং সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশের সীমা বঙ্গোপসাগর থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যান্ত নির্দিষ্ট ছিল। বঙ্গ সমতট হরিকেল প্রভৃতি অন্যান্য জনপদ নামগুলি ছাপিয়ে বাংলা নামটিই প্রাধান্য লাভ করে। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিশেষতঃ পর্তুগীজ লেখকদের রচনায় 'বেঙ্গলার' উল্লেখ তার প্রমাণ। ইংরেজ আমলে ১৭৬৫ থেকে ১৯১২ পর্য্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একসঙ্গে ছিল। ১৮২৬ সালে এদের সঙ্গে জুড়ে গেল আসাম। আবার আলাদা হলো ১৮৭৪ সালে। এই চারটি প্রদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাক ইংরেজ যুগেও ছিল। এদের অর্থনৈতিক, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গভীর। এই প্রদেশগুলির সীমানা কিন্তু আজও কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত হয়নি। ইংরেজের রাজত্বে সীমানা পরিবর্ত্তিত হয়েছে নানা কারণে বিশেষতঃ বিভেদ নীতির তাগিদে। বাংলার নানা অঞ্চল নানা ভাবে বিহার ও আসামের সঙ্গে

যুক্ত করা হয়েছে। বাঙ্গালীর 'দ্রুত' বর্দ্ধমান শক্তিকে খর্ব করার জন্য ও প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়ে ভাঙনের বীজ বপন করার জন্য আসাম যখন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো তখন সে নিয়ে গেল কাছাড় ও শ্রীহট্ট অথচ এই দুই অঞ্চলে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। এমনকি আসাম উপত্যকাতেও বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া ও নওগাঁতে, বাঙ্গালী ভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রবল। ১৯১২ সালে বাংলার কয়েকটি অঞ্চল বিহারে চলে যায় অনেক আপত্তি সত্ত্বেও। মালভূম জেলা ও সিংভূম জেলার ধলভূম অঞ্চলেই বাঙ্গালার দাবি সবচেয়ে বেশী। পুর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা শতকরা ৯৭ জন। এ ছাড়াও সাঁওতাল পরগণার কয়েকটি অঞ্চলেও বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি রয়েছে। সমাজবিন্যাস, আচার, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারেও আসাম ও বিহারের অঞ্চলগুলি বাংলায় যুক্ত হবার দাবি রাখে। সরাইকেল্লা, খরসোয়ান, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি অংশ বাংলায় যুক্ত হতে পারত। ১৯০৫ সালেও দুই বাংলার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সীমানা ছিল কিন্তু ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সীমানা রাখলেন না। হিন্দু প্রধান খুলনাকে দিলেন পাকিস্তানে আর মুসলীম প্রধান মুর্শিদাবাদকে টানলেন পশ্চিমবঙ্গে। জলপাইগুড়ি থেকে একটু দিলেন পূর্ববঙ্গে আর যশোর থেকে একটু পশ্চিমবঙ্গে। দিনাজপুরের খানিকটা, নদীয়ার খানিকটা আর গোটা মালদহটাই দিয়ে বসলেন পশ্চিমবঙ্গকে আর এক অবিচারের ক্ষতি পূরণ করতে গিয়ে মুসলমানহীন পার্ব্বত্য চটগ্রামকে ঠেলে দিলেন পূর্ব্ব পাকিস্তানে।

আমার আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গ। তাই পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা না করে, এইখানেই পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি অবয়ব গঠন করার চেষ্টা করলাম।

মোঘলযুগের শেষদিকে আলোচনা করলে দেখি যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দ্রুত দুর্বলতা বাংলাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। মারাঠাদের উত্থান, বিদেশী বণিকদের চক্রান্ত, অন্তর্দ্ধন্দ্ব, আর্থিক শোষণ ও সমাজের ভাঙন সিরাজের যুগকে অন্তঃসারহীন করে তুলেছিল। মোগলদের বিনাশ কীর্ত্তির পিছনে রয়েছে অনেক দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার, দুর্নীতি ও শোষণের দীর্ঘশ্বাস। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তখনকার দিনে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইংরেজকে সহায়তা করার ব্যাপারে তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

প শ্চি ম ব ঙ্গ (পরিসংখ্যানে)

জেলা	আয়তন ব: কি.মি.	থানা	অঞ্চলপঞ্চায়েত	মহকুমা	মিউনিসিপ্যালিটি	লোকসংখ্যা
মালদহ—	৩,৭১৩	১০	১৩৬	১	২	১,৬১২,৬৫৭
পশ্চিম দিনাজপুর—	৫,২০৬	১৬	১৪৪	৩	২	১,৮৫৯,৮৮৭
জলপাইগুড়ি—	৬,২৪৫	১৩	৯৩	২	২	১,৭৫৩,১৫৯
কুচবিহার—	৩,৩৮৬	৮	১০৫	৫	১	১,৪১৪,১৮৩
দার্জ্জিলিং—	৩,০৭৫	১৩	৫৪	৪	৪	৭,৮১,৭৭৭
মুর্শিদাবাদ—	৫,৩৪১	২১	২২৯	৪	৬	২,৯৪০,২০৪
নদীয়া—	৩,৯২৬	১৪	১৪৯	২	৬	২,২৩০,২৭০
হাওড়া—	১,৪৭৪	১৭	১৫৩	২	২	২,৪১৭,২৮৬
হুগলী—	৩,১৪৫	২০	১৮১	৪	১১	২,৮৭২,১১৬
চব্বিশ পরগণা—	১৩,৭৯৬	৫০	৫০৯	৬	২৯	৮,৪৪৯,৪৮২
মেদিনীপুর—	১৩,৭২৪	৩৭	৪৭০	৫	৯	৫,৫০৯,২৪৭
বাঁকুড়া—	৬,৮৮১	১৯	১৮৩	২	৩	২,০৩১,০৩৯
বীরভূম—	৪,৫৫০	১৪	১৫৮	২	৩	১,৭৭৫,৯০৯
পুরুলিয়া—	৬,২৫৯	১৭	১৬৭	১	৩	১,৬০২,৮৭৫
বর্দ্ধমান—	৭,০২৮	২৭	১৯৫	৫	৬	৩,৯১৬,১৭৪
কলিকাতা—	১০৪	৩২	—	—	১	৩,১৪৮,৭৪৬
	৮৭,৮৫৩	৩২৮	২৯২৬	৪৮	৯০	৪৪,৩১২,০১১

নদ-নদী

মালদহ— মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন।

পশ্চিম দিনাজপুর—আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, মহানন্দা, নাগর, করতোয়া, ছিরামতী, ডাহুক, যমুনা, ইচ্ছামতী, আগরা, উজ্জাড়।

জলপাইগুড়ি— তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, মালঙ্গী, জয়ন্তী, রায়ডাক, সংকোশ।

কুচবিহার— তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, মাথাভাঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ভৈরবী, করতোয়া, ধবলা, স্বর্ণকোশী, চম্পাবতী, কপিলা, দমনিকা, ধনদা, সমঙ্গলা, শ্বেতগঙ্গা, রূপিকা।

দার্জিলিং— তিস্তা, মেচ, মহানন্দা, রাঙ্গিত, বালাখন, রিয়াং, লিশ, ঘিস।

মুর্শিদাবাদ— ভাগীরথী, বাঁশলা, পাগলা, দ্বারকানাথ, জলঙ্গী, ভৈরবী, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা।

নদীয়া— ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, চূর্ণি, ইচ্ছামতী।

হাওড়া— হুগলী নদী।

হুগলী— হুগলীনদী, সরস্বতী, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর, কুন্তী, ঘিয়া, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, কৌশিকী, সুবর্ণরেখা, বেহুলা, কানা।

চব্বিশ পরগণা— বিদ্যাধরী, ইচ্ছামতী, মাতলা, পিয়ালী, হুগলীনদী।

মেদিনীপুর— সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ, শিলাবতী, কংসাবতী, কালিঘাই, পাগলা।

বাঁকুড়া— দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী।

বীরভূম— অজয়, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, দ্বারকা, পাগলা।

পুরুলিয়া— কাঁসাই, কুমারী, সুবর্ণরেখা, স্যাংসাই, টট্‌কো।

বর্দ্ধমান— অজয়, দামোদর, ব্রাহ্মণী, তাসলা, বাবলা, কানা, ধলকিশোর।

কলিকাতা— হুগলী নদী।

প্রকৃতি ও জনজীবন

আদিমযুগে মানুষ যখন অমসৃণ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত, তখন ভারতের অনাদি অরণ্যসমূহে বিশেষ করে ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহে ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো সম্পৃক্ত নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতির মানুষ বাস করত। এখন থেকে পাঁচ ছ'হাজার বছর পূর্বের কথা। শিকার-লব্ধ মাংস, বনের কন্দমূল এবং মাছ এদের প্রধান আহার্য্য বস্তু ছিল। কৃষিকার্য্য এরা জানত না এবং এদের সভ্যতারও কোন বালাই ছিল না। ইতিমধ্যে ইন্দোচীন থেকে অষ্ট্রিকজাতির লোকেরা আসামের উপত্যকা দিয়ে ভারতে আগমন করতে থাকে। অষ্ট্রিকজাতির মূলভাষা ও বৈশিষ্ট্য গোড়াপত্তন করার ফলে লক্ষণীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়। অষ্ট্রিকজাতির আকৃতি ও প্রকৃতি কি প্রকার ছিল তা বলা যায় না। ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ পশিলু অনুমান করেছেন যে তারা পীতবর্ণ এবং কতকটা মোঙ্গল জাতির মত ছিল। এদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণের দেশে গিয়ে এরা মালয় বা ইন্দোনেসীয় জাতিতে এবং পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে আরও মিশ্রণের ফলে মেলানেশিয়ান (Melanision), পলিনেসিয়ান (Polynision) জাতিতে রূপান্তরিত হয়। এদের কতকগুলি দল আবার ইন্দোচীনেই থেকে যায়। তাঁদের উত্তর পুরুষ দক্ষিণ বর্মা ও শ্যামের মোন্ (Mon) বা তালেঙ্ (Talang) জাতি এবং কম্বোজের খমের (Khmer) জাতি এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীনে কতকগুলি অর্দ্ধ বর্বর জাতি। এদের একটি শাখা নিকোবর দ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়। এছাড়া কতকগুলি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং ভারতবর্ষে খুব সম্ভবতঃ এরা অল্পবিস্তর আদিম নিগ্রোবটুদের সঙ্গে মিলিত হয়। ক্রমে ক্রমে নিগ্রোবটু ও অষ্ট্রিকের রক্তে মিশ্রণ ঘটে এবং এই সংমিশ্রণের ফলে কোল বা মুণ্ডাজাতির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। আবার কোথাও এই মিশ্রণ প্রায় হয় নি বললেই চলে—যেমন খাসিয়াদের মধ্যে।

হেভেশি (Havesy) নামে একজন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করেন যে ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrion) জাতির একটি শাখা সাইবেরিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আসে এবং তাদের আনীত স্থানীয় ভাষার প্রভাবে প'ড়ে কোল বা মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়। হেভেশি কোল ভাষার সঙ্গে অষ্ট্রিক ভাষার যোগ অস্বীকার করেন।

ভারতের বহুস্থানে নিগ্রোবটুদের বিলোপ ঘটে থাকলেও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে, দক্ষিণ ভারতের দু একটি বন্য জাতির মধ্যে এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থানে এই নিগ্রোবটুর অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। অষ্ট্রিকদের আগমনে নিগ্রোবটুদের জীবনের অবসান ঘটে এবং তাদের ভাষারও কোন নিদর্শন এখন নেই। উত্তর ভারতে এবং বাংলা দেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর নেই তবে বাংলার লোকদের মধ্যে কদাচিৎ এখনও নিগ্রোবটু চেহারার লোক বা নিগ্রোবটু চেহারার আমেজ নিম্নতম শ্রেণী বা জাতিতে দেখা যায়। এ থেকে এই জাতির সঙ্গে পরবর্ত্তী অষ্ট্রিক দ্রাবিড়ের মিলনই সূচিত হয়। অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষিকার্য্যের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ সুসভ্যজীবনের পত্তন করে। এরা ধান, পান, কলা, লাউ, বেগুন এবং নারিকেলের চাষ করত। প্রথমটা এদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ মুখওয়ালা কাঠের দণ্ড ব্যবহার করত, ধনুক ছিল এদের প্রধান অস্ত্র। কতকগুলি গুঁড়ি কাঠ বেঁধে বড় বড় নৌকা তৈরী করত এবং তাই দিয়ে বড় বড় নদী এমনকি সাগরও পাড়ি দিত। এরা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করত এবং মানুষের মৃত্যুর পরে তার আত্মা গাছে পাহাড়ে অথবা অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করত—এরূপ ধারণা পোষণ করত। পরবর্ত্তীকালে এদের নিয়ে হিন্দুজাতির সৃষ্টি হবার পরে সেই ধারণাই হিন্দুদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়। মৃতকে এরা হয় বৃক্ষ সমাধি দিত অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করে সমাধির উপরে দীর্ঘকায় প্রস্তর খণ্ড খাড়া করে পুঁতে দিত। এই অষ্ট্রিকজাতির ভাষার নিদর্শন ভারতবর্ষে আমরা কোল ভাষা ও খাসিয়া ভাষাগুলিতে পাই। এই ভাষার প্রভাব পাঞ্জাবের ভাষায়, উত্তর কাশ্মীরের হানজানাগিরের বুরুশাসিক ভাষাতে এবং নেপালের নবাগত কতকগুলি ভোট চীনা ভাষাতেও আছে; এবং মধ্যভারতে দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর কেরলেও এদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা হয়, অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরাণেও এদের বিস্তৃতি ঘটে থাকা অসম্ভব নয়। উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অষ্ট্রিকজাতির লোকেরাই বাস করে, সেখানে এরা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলে। গঙ্গা এই নামটি অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ বলেই মনে করা হয়। এদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি, অষ্ট্রিকরাই উত্তর ভারতের সভ্য কৃষিজীবী। অষ্ট্রিক জাতির

নৈতিক প্রকৃতি সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ; সহজেই অন্য প্রবলজাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও মননশীল। কবিত্ব-গুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং সংহতি শক্তিতে হীন ছিল। কিন্তু হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও এদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল—এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মৃত হয়নি।

ভারতের আগত শুদ্ধ বা মিশ্রিত অষ্ট্রিক জাতির সমস্ত শাখাই কৃষিজীবী বা সুসভ্য ছিল না। কতকগুলি শাখা বনে জঙ্গলে অনেকটা নেগ্রিটোদের মতই শিকার করে বেড়াত। এই অরণ্যবাসী নিম্নস্তরের অষ্ট্রিকগণই নিষাদ-কোল-ভীল বলে প্রাচীন ভারতে খ্যাত ছিল এবং এদেরই বংশধর হচ্ছে আধুনিক কোলজাতির নানা শাখা—সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, শবর, কুরকু ভীল প্রভৃতি—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিঁদুর, কলা, সুপারী প্রভৃতি অষ্ট্রিক প্রভাবেরই ফল। অষ্ট্রিকেরা গো পালন করত। বোধ হয়, তুলার কাপড় এরাই প্রথম প্রস্তুত করেছিল। প্রথম অবস্থায় এরা ধাতুর ব্যবহার জানত না, পরে ভারতে এসে তামার ব্যবহার শিখেছিল বলে মনে হয়।

অষ্ট্রিকদের আগমন হয় উত্তর-পূর্ব থেকে, দ্রাবিড়েরা আসে উত্তর-পশ্চিম থেকে। দ্রাবিড়েরা সম্ভবতঃ অষ্ট্রিকদের ভারতে আগমনের পরে এসেছিল, তবে এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করে বলার উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে একই সময়ে ভারতবর্ষের পূর্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতির আগমন হয়। দ্রাবিড় জাতিরা ইরাণ, ইরাক, এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি দেশে এবং গ্রীসে এবং গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে বাস করত—এরূপ মনে করার কারণ আছে। আবার অষ্ট্রিকদেরও প্রসার ভারতের পশ্চিমে ঘটে থাকতে পারে। দ্রাবিড়েরা অষ্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য ছিল। এদের সভ্যতা ছিল নগরকে অবলম্বন করে। অষ্ট্রিকদের মত এদের কেবল আদিম বা গ্রামীণ সভ্যতা নয়। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীর্তি বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

দ্রাবিড়েরা চাষ করত বোধ হয় যব ও গমের, এবং এরা গো-পালনও করত। শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতারা মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা ছিলেন। যোগ সাধন পদ্ধতি এদেরই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ ছিল। অষ্ট্রিকেরা সংখ্যা বহুল অথবা প্রবল ছিল উত্তর পূর্বে ও কতকটা গঙ্গার উপত্যকায়।

কিন্তু দ্রাবিড়েরা বোধ হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বেশী উপনিবিষ্ট হয়েছিল। আদিম দ্রাবিড় জাতির চরিত্র কি প্রকারের ছিল তা পরবর্তী যুগের দ্রাবিড় সাহিত্য ও দ্রাবিড় জাতি থেকে কতকটা অনুমান করা যায়। এরা কর্মঠ ও কৃতকর্মা অথচ ভাবপ্রবণ, mystic বা রহস্যবাদী, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসযুক্ত শিল্পী ও সংযমশক্তিযুক্ত জাতি ছিল। ভারতের সর্বত্রই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর মিশ্রণ ঘটেছিল। এখন যেমন ছোটনাগপুরে দ্রাবিড় জাতীয় ওঁরাও এবং অস্ট্রিকজাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়। বোধ হয় প্রাচীনকালে উত্তর ভারতের ও বাংলার বহু অংশেই সেরূপ ছিল।

দ্রাবিড়ীয় ও অস্ট্রিক লোকেরা পরস্পরের প্রতিবেশ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। মনে হয়, গঙ্গার উপত্যকায় এই দুই জাতির ও সভ্যতার বিশেষ মিশ্রণ হয়, তবে পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণাপথে এবং তামিলদেশে দ্রাবিড়রা বহুকাল ধরে নিজেদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রাখতে পেরেছিল বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামের মধ্যে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের আর্য্য ভাষায় কি সংস্কৃতে, কি প্রাকৃতে, কি আধুনিকে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার একটি লক্ষণীয় মিশ্রণ আছে। এগুলি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য ভাষা উত্তর ভারতে ও বাংলায় প্রসৃত হবার বা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়ে দেশের নদ নদী পাহাড় পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করেছিল এবং সেই সকল নামকে কোথাও ঈষৎ পরিবর্তিত করে উত্তরকালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হয়েছে। কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হয়ে অর্থহীন নামরূপে এখনও প্রচলিত রয়েছে। যথা অনার্য্য ভোট ব্রহ্ম ভাষায় তিস্তাং থেকে তিস্তা ও ত্রিস্রোতাঃ, কোল ভাষায় কফদাক থেকে দামোদর, বিকৃত অনার্য্য নাম যথা প্রাচীন বাংলার আউজাগাড্ডি, দিকমক্কা—জোলী, বঘট বা বহত, বাল্লহিট্টা, মোডালন্দী ইত্যাদি আধুনিক বাংলার বালুট, মুড়ুন্দী, বয়ড়া, চুঁচুড়া, বগুড়া ইত্যাদি। এখন থেকে তিন হাজার বছর আগে যখন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ছিল, এদেশে তখন আর্য্য ভাষা স্থাপিত হয়নি বলেই মনে হয়। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় জাতির পরে এলো আর্য্য এবং তারপর ভোট চীন জাতির শাখা—ভোট ব্রহ্ম, শ্যাম-চীন এবং অন্যান্য। এদের আদি পিতৃভূমি ছিল য়্যাংগৎসে কিয়ান (Yong-tse kiang) নদীর উৎপত্তিস্থলে। এরা খৃষ্ট-

পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে এবং হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে ভোট বা তিব্বত থেকে এদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে ; আবার এদের অন্য কতকগুলি দল যেমন মেচ শাখা আসাম ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়ে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। তবে কোন্ সময়ে এদের বাংলাদেশে আগমন হয় তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। খৃষ্টীয় নয় শতকের পূর্বে কম্বোজ নামে একটি জাতি উত্তর বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করেছিল। মনে হয়, ভোট ব্রহ্ম জাতির মানুষ বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমানায় এখন থেকে দু হাজার বছরের পূর্বেও ছিল। তখন বাংলাদেশের মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের আর্য্য ভাষা এবং আর্য্য সভ্যতা বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। সঙ্ঘবদ্ধ ভোট-চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে এসেছিল তারা, মনে হয়, প্রকৃতিতে প্রফুল্লচিত্ত, কর্মঠ, শ্রমজীবী, কল্পনাবিহীন ছিল। চীনদেশে এই জাতি এক বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাদের কোন বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়ে উঠতে পারেনি। তারা বাংলা দেশের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য্য-সভ্যতা মেনে নিয়ে, উত্তর ও পূর্ব বাংলায় বাঙালী জনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে সংস্কৃতির দিক থেকে। বাঙালী সংস্কৃতির গঠনে, ভোটচীন জাতির দান নগণ্য বলেই মনে হয়।

উত্তর ভারতের নেগ্রিটো অবলুপ্ত, অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক, নেগ্রিটো-দ্রাবিড় এইসব জনগণ যখন উত্তর ভারতের অনার্য জাতিরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করছিল, তখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত এবং দেশে কোনও ঐক্য বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না, এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, শৃঙ্খলাসম্পন্ন সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাদপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হলে গ্রহণ করতে সদাচেষ্টিত, এমন আর্য্যজাতি ভারতে দেখা দিল। আর্য্যেরা এসে খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্ম রাজ্য, এক ভাষা, এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বেঁধে দিল। আর্য্যদের আগমন কখন ঘটেছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটি মত এই যে পূর্ব ইউরোপের কোনও স্থানে আর্য্যদের আদি পিতৃভূমি ছিল। সেখান থেকে হয় তারা ম্যাসিডন ও থ্রেশিয়া এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের উত্তরভাগ হয়ে, না হয় কৃষ্ণসাগরের উত্তর দক্ষিণ রুশ দিয়ে ককেসাস পর্বত পার হয়ে প্রথমটায় মেসোপটেমিয়ায় আসে। সেখানে

বাবিল ও আসুরীয় জাতি এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতির সঙ্গে সংস্পর্শে আসে, পরে খৃষ্ট পূর্ব পনেরোশোর দিকে এদের কতকগুলি দল পূর্বে পারস্যদেশে ও ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়। ভারতবর্ষে তারা বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু সূত্র বা মন্ত্র নিয়ে আসে। তারা নিয়ে এলো নিজস্ব সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্য সভ্যজাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

ভারতবর্ষে সুসভ্য, অর্ধসভ্য সব রকমের অনার্য্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হয়েছিল। কিন্তু অনার্য্য ভারতে আর্য্যদের প্রথম উপনিবেশ হবার পর থেকেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য্য ও আর্য্য পরস্পরের প্রতি বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আর্য্যরা বিদেশ থেকে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তারা খুব উচ্চ ছিল না। আর্য্যদের ভাষা এসে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করেছিল। উত্তর ভারতের কোল এবং দ্রাবিড় অনার্য্যদের মধ্যে ঐক্য বিষয়ক ভাষার অভাব ছিল। আর্য্যজাতির মর্য্যাদা নিয়ে আর্য্য ভাষা সে অভাব পূর্ণ করল। ক্রমে ক্রমে ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত এক হাজার বছরের মধ্যে গান্ধার থেকে বিদেহ ও চম্পা (অর্থাৎ বাংলাদেশের পশ্চিমসীমা) পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে আর্য্য ভাষার জয় জয়কার হোল। আর্য্য-অনার্য্য, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক মিলে, উত্তর ভারতের (অর্থাৎ পাঞ্জাব ও বিহার পর্য্যন্ত) গাঙ্গেয় উপত্যকার হিন্দু জাতিতে পরিণত হোল। আর্য্যের ভাষা ও আর্যের ধর্ম-বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোমযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান অনার্য্যেরা শিরোধার্য করে নিল। অনার্য্যেরা আর্য্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মেনে নিল। কিন্তু অনার্য্যের ধর্ম মুছে গেল না, অনার্য্যের ইতিহাস পুরাণও হারিয়ে গেল না ; ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগ চর্চ্চা, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য্যদের বংশধরদের দ্বারাও গৃহীত হোল। আর্য্য ও অনার্য্য এই টানা-পোড়েন মিলে হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ান করা হোল।

উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হোল। এই সভ্যতায় আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেক বেশী। কেবল আর্য্যদের ভাষা এর বাহন হোল। আর্য্য ও অনার্য্যের রক্তের মিশ্রণ পাঞ্জাবে আর্য্যদের আগমনের সময় থেকে এসেছিল। গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে এই মিশ্রণ আরও অধিক পরিমাণে হোল। কোথাও বা জাতিতে জাতিতে, জাতিতে দ্বিজত্বে

অর্থাৎ আর্য্যত্বের দাবী করে বসলো এবং বহুস্থানে ক্রমে ক্রমে সে দাবী স্বীকৃত হোল। বাংলা দেশ আর্য্যভাষা নিয়ে যখন উত্তর ভারতের মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাতি হয়ে গেছে রক্তের বিশুদ্ধি বোধহয় তখন আর কোন আর্য্যবংশীয়ের ছিল না।

মৌর্য্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে আর্য্য ভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সভ্যতার বিস্তার ঘটে নি বলেই মনে হয়। মৌর্য্য বিজয় থেকে আরম্ভ করে গুপ্তরাজবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত খৃষ্ট-পূর্ব ৩০০ থেকে খৃষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত এই আটশো বছর ধরে বাংলার অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী জনগণ নিজ অনার্য্য-ভাষাসমূহকে ত্যাগ করে ধীরে ধীরে আর্য্য ভাষা অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত ভাষা গ্রহণ করে। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীরা গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ এলো, তাও বাংলায় গৃহীত হোল। এইরূপে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য্য এই তিনজাতির মিলনে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হোল। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতাই যেন এই নূতন সৃষ্ট আর্য্যভাষী বাঙালী জাতির জন্ম নীড় হোল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙালী মুখ্যতঃ অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্য রক্ত বাঙালী জাতির গঠনে এসেছিল, সেটুকু আবার উত্তর ভারতেই অনার্য্য মিশ্র হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর্য্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙালী জাতি একটি নূতন মানসিক নীতি পেল। বাঙালীর অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্যমনের ছাপ পড়ল।

বাংলা দেশে কোল, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমস্ত অন্ত্যজ জাতির পরিচয় মেলে তারা সবাই আদিম অধিবাসীদের বংশধর। ভাষার ঐক্য থেকে এদের জ্ঞাতিত্বের সন্ধান মেলে। এই সমস্ত গোষ্ঠীকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্টিক বলা হয়। ভারতবর্ষের বাইরে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী দেখা যায়। এই সব জাতিকে পরাভূত করে বাংলাদেশে যারা বসতিস্থাপন করে এবং যাদের বংশধরেরা এখন বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণভুক্ত হিসাবে পূর্বপুরুষ তারা যে বৈদিক আর্য্যগণ থেকে ভিন্নজাতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "আমরা প্রাচীন হিন্দুকাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদ পাঠ করিত, সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, যে জাতি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ

ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান।" কিন্তু তবুও আমাদের মনে একটি প্রশ্নই থেকে যায় যে বাঙালী জাতির ইতিহাস কি?

বাঙালীর দেহগঠনের বৈশিষ্ট্যের যুক্তি খুঁজতে গিয়ে বহুদিন আগে ডিজরেলী সাহেব বলেছিলেন যে বাঙালী প্রধানতঃ মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বাংলা দেশের জনসাধারণের কোনও কোনও অংশে মোঙ্গলীয় রক্তের একটা ধারাও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটে পরবর্ত্তীকালে। এইসব মোঙ্গলীয়রা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে—এরূপ একটি ধারা বাংলা দেশেও ঢুকে প'ড়ে রঙপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সিরি, নাগা, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মোঙ্গলীয় দ্রাবিড় ছাড়া আরও একধারা ভারতীয় জনস্তরে মিশে যায় তারা হোল ইন্দো-আর্য্য। এরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ে। এদের এক শাখা ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে হেলেনিক নাম নিয়ে জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করেছিলেন। অপরদল ইতালীর সপ্তগিরি শিখরে নগর নির্মাণ ক'রে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন। আর একদল বহুকাল জার্মানীর অরণ্যরাজির মধ্যে বিহার করে বেড়াতেন এবং বর্ত্তমানদের নেতা ও শিক্ষাদাতা হয়েছেন। শেষদল ভারতবর্ষে এসে অনন্ত মহিমায় কীর্তি স্থাপন করেছেন। এদের রক্ত যে বাঙালীর মধ্যে মিশেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী তারা হলেন আদি অস্ট্রেলীয় বা অস্ট্রেলিয়ড। শুধু ভারতবর্ষে নয়, একসময় আরব, আফগানিস্তান থেকে আরম্ভ করে মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এই রক্তধারা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বাঙালার জনপ্রকৃতিতে এ পর্য্যন্ত যে সব উপাদান পাওয়া যায় তাতে বলা হয় যে মিশ্ররক্ত উপাদানই বাংলার জন-গঠনের মূল ও প্রধান উপাদান। কেননা বাংলাদেশের বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, নিষাদ, কোল, ভীল, মাল, পাহাড়ী প্রভৃতিরা আদি অস্ট্রেলিয়াদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, বাউরী, বাগদি প্রভৃতি জাতি এমনকি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়স্থদের মধ্যে যে ভেড্ডিয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে

রয়েছে এমন অনুমান নৃতত্ত্ববিদরা করেছেন। পরে, কালক্রমে, নানা অবস্থায় কম বেশী মাত্রায় বঙ্গো-আর্য্য, শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মোঙ্গলীয় প্রভৃতি উপাদান এসে মিশেছে। মোটামুটিভাবে, এটাই বাংলা ভাষাভাষি জনসৌধের চেহারা এবং এই জনসৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়ে উঠেছে। শঙ্কর জাতি হলেও বিচিত্র আদান প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালীর একটা নিজস্ব দেহ বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশই মধ্যমাকৃতি ; মাথার গড়ন দীর্ঘ নয়, গোলও নয় ; নাক দীর্ঘ নয়, প্রশস্তও নয়, দেহাকৃতি দীর্ঘ নয়, বৃত্তও নয়। এই মধ্যমাকৃতি দেহই হচ্ছে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া এমন অনেক জাতি আছে তারা মূলতঃ অ-ভারতীয়। তারাও এ দেশে বহু বছর থেকে মোটামুটিভাবে জনসৌধের চিত্র রঞ্জিত করেছে। শক, হূণ, চোল ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, লুটপাট করেছে আবার কেউ কেউ রাজত্ব করার জন্য থেকেও গেছে। এদের রক্ত যে বাঙালীর মধ্যে নেই তা কেউ হলপ করে বলতে পারে না। হূণ (৭ম শতাব্দী), বর্মণ (১১দশ ও ১২দশ শতাব্দী) প্রভৃতি অবাঙালী জাতি এদেশে এসে রাজবংশ স্থাপন করে পুরুষানুক্রমে বসবাস করেছে এবং কালক্রমে এই দেশের বিরাট জনস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আরাকানী মগ, পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা উল্লেখ করা যায়। এইভাবেই শত শত বছর ধরে বাংলাদেশে জাতি সমন্বয় ঘটেছে এবং বিচিত্রগতি লাভ করেছে।

বাঙালী বলতে আমরা বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতির কথাই মাত্র বলিনি, বলেছি বাঙলার আদিমজাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি প্রভৃতির কথাও। বাঙলার বিভিন্নজাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সেই সব লোকেদের কথা বলছি, যারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন, বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলেন এবং যাঁরা চলনে বলনে চিন্তায় হাবে ভাবে এবং ভঙ্গিতে পুরোপুরি বাঙালী অথবা বাঙালীর পূর্বপুরুষ।

আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়, মোংগল প্রভৃতি অনেক রকম রক্ত মিশেছে বাঙালীর দেহে। এই রক্ত মিশ্রণ বাঙালীকে দিয়েছে অনার্য্যের শিল্প কৌশল আর ভাব প্রবণতা এবং আর্য্যের সংস্কৃতি ও তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি। বাঙলার আদি পুরুষ আর্য্য ছিলেন না। তারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করছিলেন। আর্য্যদের কাছে পরাজিত জনসমষ্টি ধীরে ধীরে আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করতে লাগলেন। প্রাক আর্য্য যুগে দ্রাবিড়, মোংগল, কোল প্রভৃতি জাতির মিলন মিছিলে বাঙলার কি

সত্তা ছিল তা আমরা জানি না, যদিও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তিনজন বাঙালী রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে বাঙলা যে কয়েকটি খণ্ডদেশে বিভক্ত ছিল তারও ইঙ্গিত আছে প্রাচীন সাহিত্যে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গাঙ্গবংশীয় বাঙালীর রাজ্যের বিস্তার ছিল পাঞ্জাব অবধি। এই রাজ্যের রণ-হস্তীর ভয়েই নাকি গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর হতে পারেন নি। টলেমির বিবরণে জানা যায় যে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে অভিধান্তরে বাঙালী রাজ্য ছিল। পরে বাঙালীকে দেখা গেল চতুর্থ শতকে বা গুপ্তযুগে। এ সময় বাঙলায় ছিল কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য। গুপ্তেরা বাঙলাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেন নি। গৌড় অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শশাঙ্কই বাঙালী রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি হন। কিন্তু মৃত্যুর পর অন্তত একশো বছর কেটেছে আত্মঘাতি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অরাজকতায়। অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল রাজা হলে বাঙলায় এল এক যুগান্তর। পরবর্তীকালে ধর্মপালের সময় বাঙালীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হয় এবং দেবপালের সময় অবধি চলে সাম্রাজ্য বিস্তার। তারপর আবার শুরু হয় গৃহবিবাদ এবং বহিঃ শত্রুর ধারাবাহিক আক্রমণ। দশম শতাব্দীর শেষে মহীপালের আমলে পালগৌরব ফিরে আসে। একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায় পালরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে ওঠে সেনরাজ্য। রাজা বিজয়সেন প্রায় গোটা বাঙলাতেই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বল্লালসেনের কীর্তি সমাজ সংস্কার ও মিথিলা জয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা, বাংলার সংস্কৃতির প্রসার ক'রে বল্লালসেন বাঁচালেন বাঙালীকে। লক্ষ্মণসেন বাঙলার সীমানা আরও বিস্তার করলেন। উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে মগধের কিছু অংশ পর্য্যন্ত। এই লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা পাঠানদের অধিকারে চলে যায়, যদিও বাংলায় ইসলামী শাসন সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী হয় নি। প্রায় চারশো বছর চলে পাঠানী আমল। হোসেন শাহের রাজত্বই বাংলায় পাঠানী আমলের স্বর্ণযুগ [১৪৯৩-১৫১১]। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বাধীন হিন্দুরাজা গণেশের আবির্ভাব। তাঁর পুত্র যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন নামে রাজত্ব করেন এবং প্রভুত্বের দাবী নিয়ে মোগল পাঠানের দীর্ঘদিন বিরোধ চলে এবং সম্রাট দায়ুদ খাঁর মৃত্যুতে (১৫৭৬] তার অবসান ঘটে। চারশো বছরের পাঠানী আমলের সমাপ্তি হলে শুরু হয় মোগল যুগ। সারা বাংলায় মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে, কেননা ঐ মধ্যবর্তী সময়ে ভূঁইয়ারা প্রচুর প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

বারো-ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদের আধিপত্য ছিল শ্রীপুর, চন্দ্রদীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলে। সোনারগাঁর ঈশা খাঁ ছিলেন হিন্দু বংশজাত। শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। এই বিরোধের ফলে শ্রীপুরের কীর্তি ধ্বংস হয়। চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র ছিলেন প্রতিপত্তিশালী জমিদার। আর একজন ছিলেন ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য। এই সমস্ত স্বাধীনচেতা জমিদারগণ বাংলায় মুসলমান শাসন স্থায়ী হতে দেয় নি। মুসলমানের পূর্বে আর্য্য, শক, হূণ, গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি এসে এদেশের আদিম অধিবাসীদের বিপর্য্যস্ত করেছে। আর্য্য-অনার্য্য সংঘর্ষ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বা ভারতীয়-ইংরাজ সংঘর্ষের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র ছিল তথাপি সমন্বয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ওরা মিলে মিশে যায় কিন্তু পাঁচশো বছরের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে যেতে পারে নি।

পশ্চিমবঙ্গ মোট ষোলটি জেলায় বিভক্ত। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতীয় বাঙালীর জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি। জনসংখ্যা হিসাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮'১২ শতাংশ লোক এই রাজ্যে বসবাস করে, যদিও আয়তনের দিক থেকে এ রাজ্যটি ভারতবর্ষের মাত্র ২.৭ শতাংশ ভূমি অধিকার করে আছে। এই ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রাজ্যটির জেলাগুলির নাম দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিমদিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া, কলিকাতা, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া। ১৯৬১-৭১ দশকে এই রাজ্যে জনসংখ্যার হার বেড়েছে ২৬'৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী দশকে (১৯৫১-৬১) জনবৃদ্ধির হার ছিল ৩২'৮ শতাংশ অর্থাৎ এ রাজ্যে প্রায় ৬ শতাংশ জনবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী এই রাজ্যকে তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে ভাগ করা যায়। প্রথম—কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি নদীমাতৃক জেলাসমূহ। দ্বিতীয়—বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি পশ্চিমের মালভূমির অন্তর্গত জেলাসমূহ এবং তৃতীয় কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চল বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল সমূহ। নদীমাতৃক জেলাসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। ১৯৫১-৬১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সনে ঐ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেড়েছে ৩৩'৯৭ শতাংশ। ঐ সময় মালভূমি অঞ্চলে ২৪'১৫ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ১৭'২২ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। উত্তরের জেলাসমূহের মধ্যে পশ্চিমদিনাজপুরের

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক (৩৭·৪৬ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন হার পুরুলিয়ায় (১৮·৪২ শতাংশ)। কলিকাতা পৌরসভা এলাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৭·৩ শতাংশ। ১৯৫১-৬১ এবং ১৯৪১-৫১ সনে এই বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৮·৪ এবং ২৪·৫ শতাংশ।

বাঙলার প্রাচীন জনপদসমূহ, যাদের একত্রিত রূপ আধুনিক বাংলা তা বিভিন্ন আদিবাসী কৌমের নামানুসারে সৃষ্ট। ডোম, চণ্ডাল, করভট, পোদ (কৈবর্ত্য মাহিষ্য) বাগদি (ব্যগ্রক্ষত্রিয়) প্রভৃতি বাংলার আদিম বাসিন্দা। মৌর্য্যযুগ অবধি বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যহেতু বাগদীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এত বেশী সংখ্যক কায়স্থ ভারতের অপর কোন রাজ্যে নেই। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বৈদ্য নামে আর একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছেন। বাঙলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছেন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সারস্বত, বৈদিক, সাতশতী, গ্রহবিপ্র, শাকদ্বীপী ও ব্যাস প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই সংখ্যাধিক। এদেশে আসার সময় ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকে এক একজন করে কায়স্থ চাকর সঙ্গে আনেন। এই পঞ্চ কায়স্থের নাম যথাক্রমে—মার্কণ্ড ঘোষ (সৌকালিন গোত্র) দশরথ বসু (গৌতম গোত্র), পুরুষোত্তম দত্ত (মৌদগল্য গোত্র), বিরাট গুহ (কশ্যপ গোত্র) এবং কালিদাস মিত্র [বিশ্বমিত্র গোত্র]। এই কায়স্থরা কুলীন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে কায়স্থ শব্দের খোঁজ পাওয়া না গেলেও পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার সমস্ত বর্ণই বর্ণশংকর। নানা 'বর্ণ পারস্পরিক যৌন মিলনে মিশ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। অ-ব্রাহ্মণ সকলেই শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত। এই শূদ্র সংকর বর্ণগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি শ্রেণী বা বিভাগের জন্য স্থায়ী বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

স্মৃতি গ্রন্থসমূহে তিন পর্য্যায়ে ছত্রিশটি উপবর্ণ বা জাতির কথা হয়েছে। বাস্তবগত তালিকায় আছে একচল্লিশটি জাতির উল্লেখ। এই তালিকায় উত্তম শংকর পর্য্যায়ে আছে কুড়িটি বর্ণ—করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায় [তাঁতী] গন্ধবণিক, নাপিত, গোষা [লেখক], কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, কংসকার,

শঙ্খকার, দাস [চাষী], বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বলী। মধ্যম সংকর বলতে তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর [গোয়ালা], তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক [শুঁড়ি], নট, শাবাক, শেখর, জালিক [জেলে] এবং অধম শংকর বলতে মালগ্রহী, কুড়র, চণ্ডাল, বরুড় [বাউরী], তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলবাহী ও মল্ল [মালো] দের উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া সৎশূদ্র তালিকায় বর্ণগুলির প্রায় সকলেই নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণরা যদি নবশাখ সম্প্রদায়ের পুজা অর্চনার কাজ করেন তারা পতিত হবেন না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরুতে নয়টি বর্ণের স্থান ছিল, বর্তমানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চৌদ্দ। নয়টি শিল্পবৃত্তি ও অর্থ উৎপাদক জাতি হিসাবে নয় শয়াক বা নবশাখ নামের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায়ের নাম এখনও বিদ্যমান। নবশাখ বলতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বর্ণের লোকদের বোঝায়—তিলি, মালী, তাম্বুলী, গোপ ও সদ্‌গোপ, নাপিত ও মধুনাপিত, গোচালী বা বারুজীবী, কর্মকার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, শঙ্খবণিক, কংসবণিক, কুড়িময়রা ও সূত্রধর। শুঁড়িসম্প্রদায়ের লোকেরা দেশী মদ তৈরী ও বিক্রি করেন। সাহা সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি বা ব্যবসা নেই। তারা সব রকম ব্যবসায় অভ্যস্ত। অবশ্য কৌলশাস্ত্রে দেখা যায় যে সাহা সম্প্রদায় মশলা ও গ্রহরত্নের ব্যবসায়ী। অন্যত্র বলা হয়েছে যে তারা ধান ও চালের কারবারী। অনেকে বলেন এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্রাট অশোকের সময় পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় আসেন। সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ আছে। তাঁদের প্রধান বাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গে এবং শুঁড়িদের প্রধান বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গ বিভাগের পর সকলে একাকার হয়ে গেছেন।

তিলি ও তেলী বা কলু একই সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তিলি সম্প্রদায় নিজেদের চেয়ে তেলী সম্প্রদায়ের লোকেদের ছোট বলে মনে করেন। তিলি সম্প্রদায় নবশাখ গোষ্ঠীভুক্ত এবং ব্রাহ্মণেরা ওদের ছোঁয়া জল খেতে পারেন। কিন্তু তেলী বা কলু অসৎশূদ্রের অন্তর্গত। কলু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণও আলাদা। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। বহু শতাব্দী থেকে এই পার্থক্য বিদ্যমান।

গোপ বা ঘোষ সম্প্রদায় গৃহপালিত পশুপালন ও দুধ বিক্রি করে থাকেন। কোথাও তাঁরা আহীর। আহীর সৎশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু বাংলার গোপ

সংশূদ্র নন। সদ্‌গোপ সম্প্রদায় সাধারণ গোপদের নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। যদিও উভয়েই নবশাখ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মণেরাই তাঁদের পুরোহিতের কাজ করে থাকেন। বাংলার উচ্চবর্ণীয়দের মত বিভিন্ন প্রকার পদবী ব্যবহার করেন সদ্‌গোপ সম্প্রদায়।

নাপিত হচ্ছে আরেকটি বিশিষ্ট জাতি। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করে বসেন। তাঁদের দাবীর মূলে তাঁদের কাজ। হিন্দুর যে কোন আচার, আচরণ, বিবাহাদি ব্যাপারে যেমন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন তেমনি নাপিতও অপরিহার্য্য। সেদিক থেকে নাপিত ও ব্রাহ্মণ একই মর্য্যাদাভুক্ত বলে তাঁদের ধারণা। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সমাজস্বীকৃত নয়।

ধোপা সম্প্রদায় আর একটি অচ্ছুৎ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ তাঁদের ছোঁয়া খাবার খান না। বাংলায় আর একটি প্রধান জাতি যোগী বা যুগী। অনেকে মনে করেন যে বিতাড়িত বৌদ্ধদের নিয়ে যোগী জাতির সৃষ্টি। তাঁরা নাথপন্থী। গোরক্ষনাথ তাঁদের গুরু। তাঁদের আচার আচরণ হিন্দুদের থেকে অনেক তফাৎ। তাঁদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁরা ধর্মপূজারী; এই ধর্মকে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম বলে মনে করেন। বাংলার নাথ ও দেবনাথ পদবীযুক্ত লোকেরা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে বলেন তাঁরা যুগীশ্রেণীভুক্ত। আধুনিক বাংলায় এই শ্রেণীর লোকেদের সংখ্যা যথেষ্ট।

কৈবর্ত্ত বাংলার প্রাচীন জাতি। তাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী চাষী বা হালিক এবং জালিক বা জেলে। চাষী কৈবর্ত্ত চাষ আবাদ করে এবং জেলে কৈবর্ত্ত মাছ ধরে বা বিক্রি ক'রে জীবিকা অর্জন করে। পাল আমলে তাদের যোদ্ধা-রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রী কৈবর্ত্ত দিব্বোক বিদ্রোহপরায়ণ হয়ে দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা ক'রে কৈবর্ত্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিব্বোক ছাড়া রুদ্রোক এবং ভীম সেই রাজ্যের শাসক ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে অবশ্য পাল রাজারা ঐ রাজ্য জয় করেন। এই সময় থেকেই উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত .হয়। মনুস্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে, নিষাদ পিতা এবং আয়োগর মাতা থেকে যে মাগব বা দাসগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তার বংশধরেরাই কৈবর্ত্ত। ওদের উপজীবিকা ছিল নৌকার মাঝিগিরি। বৌদ্ধজাতকেও এই মৎস্যজীবীদের কেবত্ত বা কেবত বলা হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গের কৈবর্ত্ত মৎস্যজীবী বা জেলে। মাহিষ্য সম্প্রদায় মনে করেন যে জেলে কৈবর্ত্তদের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য একথা স্বীকার

করে না। কৈবর্ত্তদের হালিকা ও জালিকাগোষ্ঠী তাদের দুটি বৃত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেখানে তাদের উৎপত্তিস্থল যে একই সে কথা অপ্রমাণিত হয় না। অবশ্য বর্ত্তমান বাংলায় মাহিষ্য সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে স্বীকৃত। তাদের সংখ্যাও অনেক। চাষী কৈবর্ত্ত সমাজের উচ্চাসীন হবার মূলে কৈবর্ত্ত জমিদার রাণী রাসমণির বিশেষ হাত ছিল এবং তেমনিভাবে কাশিমবাজারের মহারাজাও তিলি সম্প্রদায়কে উচ্চাসনে বসিয়েছেন। কৈবর্ত্তদের আরেকটা ছোট ভাগ আছে পাটনী। এই গোষ্ঠী জেলে ও চাষী কৈবর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়। পাটনীরা বর্ত্তমানে মাছও ধরে, চাষও করে। তারা নিজেদের লুপ্ত মাহিষ্য বলে।

নমঃশূদ্র বাংলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য জাতি। তাঁরা বৃত্তিমূলক জাতি নয়। তাঁরা বিভিন্ন প্রকার কাজে নিযুক্ত এবং হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত। কিছুদিন পূর্বেও তাঁদের চণ্ডালবর্ণ বলে গ্রহণ করা হোত। কিন্তু নমঃশূদ্ররা তাঁদের চণ্ডাল বর্ণভুক্ত মনে করতে কিছুতেই রাজী নন। নিষাদ, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতিকে অনেক সময় পঞ্চমবর্ণের লোক বলা হয়। হিন্দুসমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী ও বলশালী সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে আসছে এবং অস্পৃশ্য বলে তাদের গ্রামের শেষে বাস করতে বাধ্য করেছে। কৃষি ছাড়া নৌকা চালনাও তাঁদের কাজ। নমশূদ্রেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেন। তাঁরা বলেন যে বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য তাঁরা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পতিত হয়েছেন। তাঁরাই আসল ব্রাহ্মণ। ইতিহাস বলে যে প্রাক মুসলীম যুগে বাংলায় নমঃশূদ্রের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলতেন। তাঁদের নিজস্ব পুরোহিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কৈবর্ত্ত, পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যর্গক্ষত্রিয় প্রভৃতির অনেক মিল ছিল। তাঁরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। পূর্ব্ববঙ্গে বা বর্ত্তমান বাংলাদেশে তাঁদের সংখ্যা ছিল বেশি। বাংলা ভাগের পর তাঁদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এখানে তাঁদের সমগোত্রীয় হলেন বাগদী। তাঁরা নিজেদের ব্যর্গক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন; তাঁরাও কৃষিজীবী জাতি। পাল্কি বেহারার কাজও তাঁরা করেন। এই ব্যর্গক্ষত্রিয়দের মধ্যে অনেক উপবর্ণ আছে। যেমন, তেতুলিয়া, দুলিয়া, মতিয়া প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে আর একটি অনুন্নত সম্প্রদায় হলেন বাউরী। চাষ, মাটি কাটা পাল্কি বেহারা প্রভৃতি কাজে তাঁরা নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে হাড়ি সম্প্রদায়েরও যোগ আছে। বাহে ও বাহেলিয়া সম্প্রদায়ও অনুন্নত। অনুন্নত বেদিয়ারাও।

পশ্চিমবঙ্গে তেষট্টিটি সম্প্রদায় সিডিউল্ড কাস্টের অন্তর্ভুক্ত এবং সিডিউল্ড ট্রাইব বা খণ্ডজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা একচল্লিশটি। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, লোধা—এই উপজাতি লোক সংখ্যার নব্বুই ভাগ আর দশভাগ হচ্ছে মাহালী, ভুটিয়া, মাল, পাহাড়িয়া, লেপচা, মেচ, রাভা শবর, লোহার, গারো, বীরহোড়, চাকমা, হো, টোডা প্রভৃতি। এদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, সমতলভূমির উপজাতি সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়, বন বা পাহাড়াশ্রয়ী সম্প্রদায়। সাঁওতাল সম্প্রদায় সিডিউল্ড ট্রাইবের মধ্যে অন্যতম। তারা প্রাক দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক। ওঁরাও দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী। লোধা সম্প্রদায়কে বলা হয় বিমুক্ত জাতি। তারা অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল বৃটিশ যুগে। বীরহোড়েরা দুটি সমগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে যারা উথলু তারা অর্দ্ধ যাযাবর এবং যারা জাটি তারা স্থায়ী বাসিন্দা। ভুটিয়া গোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয়। তারা ডুকপা, কাগাতে, শেরপা প্রভৃতি উপগোষ্ঠী এবং মেচেরা মোংগল গোষ্ঠীর লোক। রাভাদের মধ্যে আছে বনবাসী ও গ্রামবাসী। এই দুটি গোষ্ঠীর লোক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে। যেমন বর্দ্ধমান জেলায় বাগ্দী, সাঁওতাল, বাউরী, সদগোপ, আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে জনগণের সর্ব্ববৃহৎ নিম্নস্তর। বীরভূমে বাগ্দী ও সাঁওতালদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। এখানে অনেক মুসলমান বাস করেন—শেখ, পাঠান, সৈয়দ ও জোলা। তাছাড়া রয়েছে পটুয়া, মুচি, ডোম, মাল, বাউরী, হাড়ি সম্প্রদায়। বাঁকুড়াতেও অনেক মুসলমান বসবাস করেন। তারা শেখ ও সুন্নী সম্প্রদায়। এখানে তেলি ও ডোমদের সংখ্যাও কম নয় কিন্তু বেশী সংখ্যায় বাস করে বাউরী, সাঁওতাল ও বাগ্দী শ্রেণীর লোক। মেদিনীপুরে মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, সাঁওতাল, বাগ্দী, সদগোপ, তাঁতী, কুর্মী, তেলি, হাজু, গোপ, করণ, ভূমিজ, নাপিত, কদমা, ধোপা, লোহার, পোদ, শুক্লি, কুমার, হাঁড়ি, তুঁতিয়া ও লোধাদের বাস। এখানে প্রচুর মুসলমানও বাস করেন। শুক্লি ও তুঁতিয়ারা বৃত্তি অনুসারে মুসলমান। এখানের মাহিষ্যরা কৃষক। হুগলী জেলায় যে মুসলমান দেখা যায় তাঁরা শেখ, আজলা, বেদিয়া, ধওয়া এবং জোলা। বাগ্দী, বৈষ্ণব, বাউরী, গোপ, মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, কামার, মুচি, নাপিত, সদগোপ, তাঁতী ও তেলিদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। হাওড়া জেলার মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নী। বেশীর ভাগ শেখ, মল্লিক। পাঠান বা সৈয়দের সংখ্যা কম। ওঁরাও, সাঁওতাল, গোপ, সদগোপ, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য,

বাগ্দী, পোদ, মুণ্ডা, ও কাওড়া সম্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাও যথেষ্ট। চব্বিশ পরগণা জেলায় বহিরাগত লোকের সংখ্যা বেশী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলাদেশের লোক এখানে বাস করেন। জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান। তাঁরা সুন্নী, শেখ ও জোলা। ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল অল্প। পোদ, মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, গোপ, তিয়র, মুচি, নাপিত, বৈষ্ণব ও নমশূদ্র প্রধান। তাছাড়া বুনোদের একটি সম্প্রদায়ের লোককে এখানে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদে আছে প্রচুর মুসলমান। এখানে সুন্নী, শিয়া ও শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বাস। ওঁরাও, কোড়া, সদ্গোপ, চাইমণ্ডল প্রভৃতির সংখ্যাও কম নয়। মালদহে জোলা, তাঁতী, ধুনিয়া, নলুয়া, কুঁইয়া, পীর, কোদালীদের দেখা যায়। তাছাড়া তাঁতি, কামার, কোচ, রাজবংশী, অনেক। পশ্চিমদিনাজপুরের মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত রাজবংশীদের বংশধর। এখানে সৈয়দ, পাঠান ও মোগল সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দেখা যায়। এক শ্রেণীর ফকির ও রাজপুত, চাষী, কৈবর্ত্ত, যুগী, তাঁতী, নাপিত, ও বৈষ্ণব বাস করে। জলপাইগুড়ির মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—অধিকাংশই শেখ। এখানে থাকে ভুটিয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, লেপচা, গারো, মেচ, টোডো, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি। দার্জ্জিলিং-এ সুন্নী ও শেখ মুসলমান, সাঁওতাল, মেচ, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভুটিয়া, লেপচা, শেরপা, ছত্রী, মংগর, নেওয়ার, গুরুং, কাগাতে প্রভৃতি আর কোচবিহারের অধিকাংশই রাজবংশী। আর আছে কোচ, পালিয়া, মেচ, সাঁওতাল, ওঁরাও, টোডো প্রভৃতি জাতি। মুসলমানের সংখ্যা অন্যান্য জেলার মত। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশী। এ আধিপত্য আগে আরও বেশী ছিল মনে হয়। সাম্প্রতিক লোক-গণনাতে দেখা গেছে যে এইসব জাতির আধিপত্য এখনো বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ব্যগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা নয় লক্ষের কিছু বেশী। তার মধ্যে শুধু বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় সাড়ে তিন লক্ষের বেশী অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগ এবং মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীতে সাড়ে চার লক্ষের বেশী। কেবল রাঢ় অঞ্চলেই মোট নয় লক্ষের মধ্যে আট লক্ষের বেশী ধীবর শ্রেণীর লোকের বাস। ধীবররা সকলেই যে এখন মৎস্যজীবী বা মৎস্য ব্যবসায়ী তা নয়। অনেকে কৃষিজীবীও। সকলেই সাধারণভাবে আজ ব্যগ্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরীদের সংখ্যা হলো তিন লক্ষের কিছু বেশী ; তার মধ্যে শুধু বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিনটি জেলাতেই আড়াই লক্ষের বেশী বাউরী বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরীর সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী বাঁকুড়া জেলায়। ডোম জাতির মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষের কিছু বেশী ; তার মধ্যে তিন ভাগের দুভাগের বাস বর্দ্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধীবর, বাউরী ও ডোম এই তিনটি জাতির মোট জনসংখ্যার মধ্যে ধীবর তিন ভাগের দুভাগ কেবল রাঢ় দেশের তিনটি জেলাতেই বাস করে। আদিম জাতির মধ্যে বাংলাদেশে সাঁওতালরাই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সাঁওতালদের বাস বর্দ্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায় দু লক্ষ।

বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরের রাজাদের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী, স্বাধীনতা-প্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদান্যতা, ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মত অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও, এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল। সুবিস্তৃত মল্লভূমির যাঁরা স্বাধীন রাজা ছিলেন তাঁরা মল্লবীনাথ বলে পরিচিত। মল্লভূমের সীমানা তখন উত্তরে সাঁওতাল পরগণার দামন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশ, পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের একাংশ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট-মানভূম ও ছোটনাগপুরের অনেকটা অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। হিন্দুযুগে মল্লরাজাদের সঠিক কোন ইতিহাস জানা যায় না। মনে হয়, বাঙলার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্য স্বাধীন স্থানীয় রাজাদের মত তাঁরাও রাজস্ব আদায় করতেন এবং প্রতিবেশী দুর্বল রাজা, গোষ্ঠী ও কৌম (tribal) সর্দ্দারদের পরাজিত করে, ক্রমে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছিলেন। সীমান্তের আদিবাসী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে মল্লরাজাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং সেজন্য তাঁরা রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। বাংলার আদিবাসী, ধীবর, ডোম প্রভৃতি জাতি বীর যোদ্ধার জাতি এবং বাঙালীর বীরত্বের কাহিনীর প্রধান নায়ক তারাই। ডোমেদের শৌর্য্যবীর্য্য যে একসময় বিখ্যাত ছিল তার প্রমাণ হিসাবে আজও লোকমুখে সেই ছড়া প্রচলিত আছে—

"আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ডোম সাজে
ঢাল মেঘর ঘাঘর বাজে।"

বাংলাদেশের এই ধরণের জনপ্রিয় ছড়ার মধ্যেও বাংলার জনসেনার স্মৃতি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বর্তমান বাঁকুড়া জেলায় মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ হয় আদি উপজাতি নয় হিন্দু-সমাজভুক্ত তপশিলী সম্প্রদায়। বস্তুতঃ মল্লভূমে বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠার আগে এই আদিবাসী ও আর্য্যেতর সম্প্রদায়গুলি যে আর্য্যসভ্যতাপুষ্ট বর্ণ-হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে বিগত কয়েক শতাব্দী আগে এই হিন্দুগণ বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলা থেকে এই জেলায় অনুপ্রবেশ করেছিল। এই জেলায় আর্য্য সভ্যতা খুব মন্থর গতিতে প্রবেশ করেছিল কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ অঞ্চলে আদিবাসীরা তাদের সমাজ ও সভ্যতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও প্রচলিত সংস্কার নিয়ে বসবাস করছিল। তারা আর্য্য সভ্যতার প্লাবনে নিজেদের হারিয়ে ফেলেনি। এই উন্নততর সভ্যতা থেকে তারা যেমন নিয়েছে অনেক, দিয়েছেও অনেক। ফলে, দীর্ঘকাল সাংস্কৃতিক বিনিময়ে বাঁকুড়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই জেলায় উপজাতিগুলি সাঁওতাল, বাগদী, বাউরী, ভুইয়া, ভূমিজ, ধোবা, ডোম, ময়রা, কোরা উপজাতির শাখা এবং শারীরিক গঠনে প্রাচীন দ্রাবিড়গণের বংশধর। ডাল্টনের মতে, ভারতবর্ষে তাদের আদি উপনিবেশ ছিল এবং বাংলা বিহার সীমান্তে তাদের প্রথম আবির্ভাব প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাদের প্রধান দেবতা হলেন সিঙ্‌বোঙা বা সূর্য্য, আবার অনেকে বলেন মারাং-বুরুকে অর্থাৎ পাহাড় তাদের প্রধান দেবতা। দেবী হলেন মারেকো, জাইর-এরা ও গোঁসাই-এরা। সাঁওতালদের পরেই বাউরী জাতির স্থান। হিন্দু সমাজভুক্ত হলেও এরা যে অনার্য্য বংশোদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে আবার গোমাংস ভক্ষণ করে যা হিন্দুসমাজ বিরুদ্ধ। বাউরীদের উপাস্য দেবদেবী হলেন মনসা, ধর্মরাজ, ভাদু, মানসিংহ, কুদ্রা ইত্যাদি। বাগদী সমাজে টোটেম পূজার রীতি বাউরীদের মত প্রচলিত এবং আচার অনুষ্ঠানেও এই দুই-জাতির খুব একটা পার্থক্য নেই। বর্তমানে সংখ্যায় খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও রাঢ় অঞ্চলে চণ্ডাল বা ডোমেরা এক সময়ে প্রতিপত্তিশালী ছিল। রিজলী সাহেব বলেছেন এরা মূলতঃ দ্রাবিড় জাতীয়। এরা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হলেও ধর্মরাজ, ভাদু ও অরণ্য দেবতা কালুবীরের পূজা সমানে করে আসছে। অনেকে আবার কালীর ভক্ত। বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী হোল মাল বা

মল্ল। মল্লভূম শব্দটির উৎপত্তি মাল উপজাতি থেকে। এই সম্প্রদায় সংখ্যায় নগণ্য হলেও গুরুত্বে নয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বাগদী উপজাতি মালগোষ্ঠীর আর্য্য প্রভাবিত অংশ। মালদহ জেলার নামকরণ এই মাল উপজাতি থেকে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা যে মালবংশোদ্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ওল্ডহ্যামের মতে, এক সময়ে মাল বা মল্লজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজমহলের মালার, সাঁওতাল পরগণার মাল পাহাড়ি, বর্ধমান-বাঁকুড়ার মাল, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিরাট জাতি থেকে উদ্ভূত। ক্ষত্রিয় পদবী সিংহ উপাধি ধারণ করার আগে বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজারা মল্ল বলে পরিচিত ছিলেন এবং এখন পর্য্যন্ত তারা বাগদি রাজা বলে সর্ব্বত্র পরিচিত। বাঁকুড়া বীরভূম বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের রাজারা সেই সময় হাড়ি, ডোম, বাগদি, মল্ল, লোয়ার, খররা প্রভৃতি জাতিকে সৈন্যদলে স্থান দিতেন। এরা অন্তঃপুরে রক্ষক ও রাজার দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত। সৈন্যদলে গোয়ালা, সদগোপ, শুঁড়ি, আগুরী প্রভৃতি জাতির সংখ্যাও প্রচুর ছিল। মাল, মাল পাহাড়িয়া, ওঁরাও, শবর প্রভৃতি জাতি দ্রাবিড় জাতীয়। মালদের প্রধান উপাস্য দেবী হলেন মনসা।

লোক সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাই। যেমন, একদিকে ইন্দ্রপূজা বা ইঁদ পূজার ব্যাপক প্রচলন অন্যদিকে টুসু, ভাদুর উৎসব উদ্‌যাপন। চুয়াগান নামে এক ধরণের বৈরাগ্যমূলক গানও শুনতে পাওয়া যায় এই জেলায়। এছাড়া রয়েছে হাপুগান, মনসাগান, পটের গান, ধর্মঠাকুরের গান ও ঝুমুরের গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীত। বাগদী বা বাউরীদের মধ্যে ঘোড়া নাচ, এক ধরণের কাঠি নাচের এবং আদিবাসীদের মধ্যে করম নাচ ও মাঝিনাচের প্রচলন দেখা যায়।

বাঁকুড়ার পটুয়াদের আঁকা পট ও কাঠের পুতুলের শিল্প কৌশল ও রঙের ব্যবহার অতুলনীয়। এছাড়া ডোকরা শিল্প, পাথরের কাজ, দশাবতার প্রভৃতি তাদের শিল্পগুণ বাঁকুড়া জেলার শিল্প কুশলতার বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিষ্ণুপুরের রেশম শিল্পের খ্যাতি সারা বাংলায়। এছাড়া সোনামুখী, বীরসিংহ ও জয়পুর প্রভৃতি স্থান রেশম ও তসর বস্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, পাত্রসায়ের প্রভৃতি স্থানের তাঁতবস্ত্র খুব

উন্নত। পিতল কাঁসা ও তামার বাসন বাঁকুড়ায় প্রচুর তৈরি হয়।

বাঁকুড়া সদর মহকুমায় লাক্ষার চাষ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে সোনামুখীতে অনেক লাক্ষাকুঠি তৈরি হয়েছিল এবং তাদের অস্তিত্ব কোন কোন জায়গায় আজও বিদ্যমান। বালসী প্রভৃতি গ্রামে তুলসী কাঠের মালা তৈরি হয়ে থাকে। তৈরি হয় সুন্দর সুন্দর বাদ্যযন্ত্র।

বিষ্ণুপুরের অম্বুরী তামাক শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতের তাম্রকূট সেবীদের লোভনীয় বস্তু।

বর্ধমান জেলার বর্তমান গোপদের আদি পুরুষ তারাই যারা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী ও উন্নত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কৃষির পত্তন করেছিল যারা, তারাই বর্তমান সদগোপদের আদি পুরুষ। বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের নাম আজও পরগণা গোপভূম। পশুপালন ও কৃষিকার্য—দুই তারা করত। সুতরাং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করার বা যাযাবর স্তর থেকে প্রকৃতিকে জয় করে খাদ্য উৎপাদন করার স্থায়ী সভ্য স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে আদিম পশু-পালক ও কৃষক উভয়েরই দান সমান, মর্য্যাদাও সমান। যাঁরা আর্য্য শ্রেষ্ঠতর মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের আর্য্যোৎপত্তি প্রমাণ করতে চান, তাঁদের মনে ধারণা হওয়া উচিত যে, আর্য্যরা প্রধানতঃ পশুপালক ছিলেন এবং কোন উন্নততর সভ্যতা বহন করে আনেননি। পশুপালনের চেয়ে কৃষিই উন্নততর স্তর এ ধারণা ভুল। নৃবিজ্ঞানীরা এ মত সমর্থন করেন না। দীর্ঘকাল ধরে বন্য হিংস্র পশুর আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য করে তাকে বন্দী করে পোষ মানানোর ও পালন করার কৌশল আয়ত্ত করা এবং তার বংশবৃদ্ধি করে তার মাংস, দুধ ইত্যাদি খাদ্যের সংস্থান করা, চাষ করে ফসল ফলানোর চেয়ে কম যুগান্তকারী নয়। একারণে, পশু পালনও তেমনি স্থায়ী গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছে। যাই হোক, গোপ ও সদগোপরাই পশ্চিমবাংলার পশুপালন ও কৃষি সভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক বলে মনে হয়। বর্দ্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে সদ্‌গোপ ও গোপদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিপত্তি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বন্য যাযাবরের স্তর থেকে তাঁরা এই অঞ্চলের সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। দলপতি, গোষ্ঠীপতি, কৌমপতি থেকে তাদের মধ্যে অনেকে পরে রাজাও হয়েছিলেন। গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজ-

বংশের ইতিহাস বর্ধমান তথা রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ভাল্কী, অমরার গড়, কাঁকড়া, রাজগড়. গৌরঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদ্‌গোপদের যে বিরাট দান আছে আজও তার গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়নি। গোপভূম অঞ্চলের অধিবাসী শৈব সাধনার অন্যতম ধারক ও বাহক। সর্ব্বত্রই গোপদের সঙ্গে শিবের উৎপত্তি জড়িত। বৰ্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দেরও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। অনেকে মনে করেন, উগ্রক্ষত্রিয়রা বাংলার বাইরে থেকে অভিযাত্রী রাজাদের সঙ্গে যোদ্ধা হয়ে এদেশে এসেছিল যেমন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ নেগ্রিটো থেকে আরম্ভ করে আদি অস্ট্রেলিয়ড জাতির পূর্ব্বপুরুষ দ্রাবিড়, আর্য্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল, সকলেই এসেছে বাইরে থেকে। কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়দের বাংলাদেশেই সম্পূর্ন বিকাশ ঘটেছে। তারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী এবং প্রাচীনকালে শৌর্য্যবীর্য্যে তাদের সমকক্ষ কোন জাতি ছিল না। গোষ্ঠীপতি ও দলপতি থেকে তারাও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। বৈদেশিক অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তারা নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছে। বাংলার পালরাজারা এ রকম এক জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। যেমন, অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে গুপ্তরাজবংশের বিকাশ বাংলার মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকেই হয়েছিল। বর্ধমানের প্রান্তে ব-দ্বীপাংশে ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের অবদান অপরিসীম। বাংলার ধীবর, চাষীদের পূর্ব্বপুরুষরাই বাংলার সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি যে সরবরাহ করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। মঙ্গলকোটের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপি থেকে জানা যায় যে আধুনিক সাঁওতাল, বাউরী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পূর্ব্ব-পুরুষেরা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাঢ় অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ কৃষিপল্লী স্থাপন করেছিল এবং নদী, সমুদ্র পেরিয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। এই জেলার লোক সংস্কৃতির মধ্যে ভাঁজো গান ও নাচের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই—গান আকারে ছোট বা বড় হতে পারে। এই জেলার ভাদু পূজো মেয়েদের নয়—ছেলেদের। এই উদ্দেশ্যে গান রচনা হয়ে থাকে। আলকাপ গানের অল্পবিস্তর প্রচলন আছে এই জেলায়। তাছাড়া কবি, পাঁচালী, যাত্রা-গান এই জেলার শ্রেষ্ঠ অবদান।

পশ্চিমবাংলায় প্রস্তরযুগ থেকে সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল আদি অস্ট্রেলিয়ডরা। তাদের বংশধর মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল এবং বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যস্ত শবর, লোধা, কোড়া প্রভৃতি জাতি। এক সময় তারা তীর-ধনুক ও পাথুরে হাতিয়ার নিয়ে বনে জীবজন্তু শিকার করত, ফলমূলাদি আহরণ করত, আবার বনজঙ্গল পরিষ্কার করে তারাই বসতি গড়ে তুলেছিল। এদের আদিবাস সম্ভবতঃ শিলদা পরগণা বা সাঁওতাল পরগণা। তবে কিভাবে তারা মেদিনীপুরে এসেছিল তা বলা সম্ভব নয়। এখানে অষ্ট্রিক ভাষাভাষি অন্য কোন জাতি সাঁওতালদের পূর্ব্বে বসতি স্থাপন করেছিল কিনা এবং কবে করেছিল তা বলা যায় না। তা করলেও অষ্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধ গঠন প্রধানতঃ সাঁওতালদের দ্বারাই হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার সংস্কৃতিতে অষ্ট্রিক উপাদান মিলে মিশে যে কত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সুদূর অতীতে তাম্রলিপ্ত যখন একটি স্বতন্ত্র বিরাট সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বাণিজ্যবন্দর ছিল তখন পার্শ্ববর্ত্তী মহিষাদল, দরো, ওমগড়, কেওড়ামাল ও হিজলীর পরগণাগুলি বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত ছিল। কালক্রমে, ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের এবং কপিশা (কংসাবতী)র জল প্রবাহিত মৃত্তিকায় গঠিত হয়। এই ভাটিমহাল পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বিস্তারে সহায়তা করেছে।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্য কংসাবতী নদীর উত্তরাংশে এবং দক্ষিণাংশে উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজাদের রাজ্য। কোম্পানী রাজত্বের পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও হিজলী দুটি পৃথক জেলা ছিল। পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হিজলী মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক আছে। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষায় কম। হিন্দুদের মধ্যে মাহিষ্যরাই গরিষ্ঠ সম্প্রদায়, তারপরে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ। শিক্ষাদীক্ষায় ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও করণ এই তিন সম্প্রদায় অগ্রগামী কিন্তু সমাজসেবা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মাহিষ্যরাই শীর্ষস্থানীয়। মাহিষ্য ব্যতীত যে সব ধর্মহিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রধান। তাদের পদবী সাধারণতঃ পাণ্ডা, সনবিগ্ন, মিশ্র, আচার্য্য, মহাপাত্র, তিয়ারী, ত্রিপাটি প্রভৃতি। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোকজনদের পদবী অদ্ভুত। যেমন দীণ্ডা, কলা, মূলা, ঘোড়াই, গিরি, প্রধান, সাহু, ওঝা, ওগরা, মাটিয়া, ভূঁইয়া, গায়েন

প্রভৃতি। তাছাড়া মান্না, মাইতি, ভৌমিক, বেরা, মাঝি, দাম, পাল ইত্যাদি তো অন্য সব জেলাতেই রয়েছে। আর আছে শবর বা সাপুড়ে শ্রেণীর এক বলিষ্ঠ সম্প্রদায়। সাপ ধরাই তাদের প্রধান কাজ। এরা নলা (telescopic spear) চালিয়ে পাখি শিকার করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। স্ত্রীলোকেরা খেজুর পাতার পাটি তৈরি করে। মেদিনীপুরের কাকমারা আর এক যাযাবর সম্প্রদায়। এদের জীবনযাত্রা বড় অদ্ভুত। এরা ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করে এবং মৃতকে সমাধি দেয়।

মহালীরা সম্ভবতঃ নিষাদজাতীয় এবং এদের পদবীগুলি সাঁওতালদের মত। যেমন বাস্কে, সোরেন টুডু, হাঁসদা ইত্যাদি। বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে এরা জীবিকা অর্জ্জন করত। মহালীদের মোড়লকে মাঝি বলা হোত। কোড়ারাও এরকম একটি বিচ্ছিন্ন জাতি বলে মনে হয়। হয়তো মহালীদেরও আগে এরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আজও এরা ভালভাবে চাষ আবাদ করতে জানে না। খড় কুটো দিয়ে গোলাকার গৃহ তৈরী করে। এ ধরণের বাসগৃহ মানুষের আদিমতম গৃহের নিদর্শন। কোড়ারা অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে গেলেও আজও তাদের অনেকে এ ধরণের ঘর তৈরি করে, এটাই উল্লেখযোগ্য। কোড়ারা যে কুদ্রাপূজা করে তাও সাঁওতালদের অন্যতম দেবতা। কোড়ার প্রকৃত অর্থ যারা মাটি কাটে। লোধাদের ইংরাজরা Criminal tribe বলে চিহ্নিত করে গেছেন। দুর্বৃত্তের রাজচিহ্ন ললাটে এঁকে অভিশপ্ত ও উপেক্ষিত জীবন যাপন করে আজ তারা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এরাও বনে জঙ্গলে শিকার করত। ফলমূলাদি আহরণ করত, মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা —এ সবই তাদের পেশাগত ব্যাপার। তাই মনে হয় লোধারা দুর্বৃত্ত নয়। লোধাদের মোড়লকে মুখিয়া বলে। এদের উপাধির মধ্যে নায়েক, মল্লিক, দিগর, কোটাল, সর্দার, দণ্ডপাঠ এবং ভুঞা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুরে আরও কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কাক-মারা, কলমাদার, শিয়ালগিরি ইত্যাদি। কাকমারারা নিজেদের তেলিঙ্গা বলে পরিচয় দেয়। এরা গোমাংস ছাড়া আর সকলের মাংস খায়। দক্ষিণ ভারতীয় তেলেগুভাষী জাতির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ এরা এবং হিন্দু সংস্কৃতির অনেক কিছু বিধিনিষেধ পালন করে। পোষাক এদের বিচিত্র। পালকমালা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, শামুক ঝিনুক দিয়ে নিজেদের দেহ ঢেকে রাখে। শিকার ও ভিক্ষাবৃত্তি এদের একমাত্র অবলম্বন। এরা কোথাও এক জায়গায়

বেশী দিন থাকে না, যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করে। কলমাদার, শিয়ালগিরি সম্ভবতঃ ভীলজাতির বংশধর। নির্দ্দিষ্ট পোষাক নেই। নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও এরা না হিন্দু না মুসলমান। সিঁথিতে সিঁদুর দেয় অথচ বিবাহ হয় মুসলমানী কায়দায়।

দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের সীমান্তে মেদিনীপুরের স্থান। একদিকে দাক্ষিণাত্যের অন্যদিকে আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃতিধারা এসে মিলিত হয়েছে বাংলা দেশে—মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, জুয়াঙ্গ, লোধা, কোঁড়া প্রভৃতি উপজাতি এবং বাগদী, ডোম, মুচি, তিলি ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়েই মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মত এখানেও টুসু গানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া কাঁদনাগীত (বিয়ের গান), পাতানাচের গান, হুপু খেলার হেঁয়ালী, করম, জাওয়া এবং ধানবোয়া গানের বিশেষ প্রচলন আছে। যে রত্ন সম্পদ বাংলার আর কোথাও তেমনভাবে নজরে পড়ে না—তা হচ্ছে এই জেলার ধাঁধা ও লোককথা। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের প্রভাব ঝাড়গ্রামে কিছু লক্ষ্য করা গেলেও রীতিবিচারে কিছুটা পৃথক। ফলে এখানকার ছৌ-নৃত্য ততটা material নয় যতটা lyrical. এ ছাড়া নাচনী, খেমটি, সাঁওতালী, মাঝি, পুতুল নাচ প্রভৃতি অল্পবিস্তর প্রচলন আছে। এই জেলার বিনপুর এলাকায় চাঁইনাচ নামে এক ধরণের নৃত্য দেখা যায়। এই জেলার লোকদেবতা হলেন ভীমঠাকুর, মাকালঠাকুর, পাঁচু ও বড়ানঠাকুর। কোথাও কোথাও ইঁদপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গড়বেতায় কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত দেবীর পূজ্জার্চ্চনার কথা জানা যায়। এ ধরণের নাম পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। যেমন, রূপাসিনীদেবী, শিকড়াসিনী, নাচনজামসিনী, ঝাড়বলিসিনী দেবী ইত্যাদি। এঁরা সবাই বনদেবী এবং সমাজের আদিম জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিতা। আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজ কর্ত্তৃক পূজিত হন বিভিন্ন দেবদেবী—টুসু, করণ, শালুই-সহরায়, জাহীরবুড়ি, বংগঠাকুর, ঘন্টাকর্ণ, কালোরায়, কালামদন, তেঁতুলাবুড়ী ইত্যাদি।

মেদিনীপুরের মত হুগলীতেও সদ্‌গোপবংশীয় সমস্ত রাজাদের কথা শোনা যায়। পশ্চিম বর্দ্ধমানের গোপভূম অঞ্চল থেকে সদ্‌গোপ রাজবংশের বিভিন্ন বংশধররা পূর্ব্বে মেদিনীপুর থেকে হুগলী পর্য্যন্ত নানাস্থানে ছোট ছোট রাজ্য বা জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। সদ্‌গোপদের মধ্যে দুটি প্রধান কুল আছে—পশ্চিমকুল ও পূর্ব্বকুল। পূর্ব্বকুলের সদ্‌গোপবংশের মধ্যে অনেকেরই আদিবাস

হুগলী জেলায়। মুসলমান আমলে বৈদ্যদের বেশ আধিপত্য ছিল এবং তাঁদের অনেকেই রাজকর্মচারী ছিলেন এবং অনেকে বহু ধনসম্পত্তি ও জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। রায়, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধি তারই সাক্ষী। মোগল আমলে হুগলী জেলায় মুসলমানদের আধিপত্য গ্রাম্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন গোত্রের রাজপুতবংশ বাংলাদেশে চলে আসেন। মগের মুল্লুকের লোভনীয় আকর্ষণই এই আগমনের প্রধান কারণ বা প্রেরণা। পরে তারা বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় সিংহরায় উপাধি নিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে ও ভোজ সভায় তাঁরা কাঠের পিঁড়িতে বসেন এবং ধাতুর পাত্র ব্যবহার করেন। পাল ও সেনরাজাদের আমল থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত সপ্তগ্রামের উন্নতি ও ঔজ্জ্বল্যে হুগলী জেলাকে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও শ্রীময়ী করে তোলে। তারই আকর্ষণে সাতসমুদ্র পার হয়ে অপরিচিত মুখের আমদানী ঘটেছে। তারা কখনও হার্মাদ, ও পর্ত্তুগীজ, কখনও ফরাসী ও কুঠিয়াল আবার কখনও বা পাদ্রী। হুগলী জেলার মধ্যে কৈবর্ত্ত ও বাগদী জাতি সর্ব্বপেক্ষা অধিক এবং কায়স্থ ও তেলী-জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। কৈবর্ত্ত ও বাগদী জাতির হুগলি জেলায় বসবাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব তাদের আদিতে অনার্য্যজাতি বলে বর্ণিত করেছেন। পরবর্ত্তীকালে তারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েছিল। বাগদী হুগলী জেলার আদিম অধিবাসী। বকডিহি পরগণাতে আদি নিবাস ছিল বলে এদের বাগদী নামকরণ হয়। মেগাস্থিনিস যে গঙ্গারিডয় দেশের কথা উল্লেখ করেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে, এই বাগদীগণই সেই রাজ্যের আদিম অধিবাসী। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলত। Theft is of very rare occurrence and leave their houses and property unguarded। এই জেলায় লৌকিক দেবতা হলেন শিব; তারপরেই মনসা এবং ধর্মরাজের স্থান। এ ছাড়া বিচিত্র নামে, বিচিত্র স্বভাবের অসংখ্য লোক দেবতা রয়েছেন। যেমন, হাঁপাকালী, বুড়োদামান, নোয়াজন ঠাকুর এবং দ্বারিকাচণ্ডী ইত্যাদি। কলিকাতা শহর কাছে থাকায় সমস্ত রকম বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত হুগলী ও হাওড়া জেলার যথার্থ অর্থে নিজস্ব লোক সাহিত্য—কলা—সঙ্গীত ইত্যাদি গড়ে

তুলতে পারে নি। যা কিছু নজরে পড়ে তা হচ্ছে চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের দান। একসময় সয়লা উৎসবের ধুম পড়ে গিয়েছিল সারা হুগলী জেলায়—বর্তমানে নেই বললেই চলে। কোন কোন অঞ্চলে মঁশিয়া গান ও নাচের প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া আছে মাণিকপীরের গান, সত্যপীরের গান ও পটের গান ইত্যাদি।

আজকের দিনের কলিকাতার দিকে তাকিয়ে কেউ চিন্তা করতে পারে না সেই একদা তিনটি গ্রামের কথা—সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। নেই সেই পচা ডোবা, জল-জঙ্গল, রোগ-বালাই। বসবাস আর ব্যবসায়ের উপযুক্ত স্থান ভেবে জব চার্ণক সেই যে কলিকাতায় আস্তানা নিলেন তারপর অনেক ঝড় ঝাপটা, বর্গির হাঙ্গামা, মুসলমান শাসন, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হোল আধুনিক কলিকাতা। সাহেবদের ব্যবসার পাশে আশপাশের জেলা থেকে নানাজাতের মানুষ জীবিকা অর্জনের নানান ধান্দায় কলিকাতা অঞ্চলে এসে ভিড় করল। তার আগে সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা গ্রামে বাস করত জেলে, বাউরী, চূণারী, শাঁখারী, সহিস, পাল্কিবেহারা ইত্যাদি সম্প্রদায়। আর তাদেরই নামানুসারে পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের নাম হয় কাঁসারীপাড়া, বেনেটোলা, জেলেপাড়া, দর্জিপাড়া, যুগীপাড়া, শাঁখারীটোলা, আহিরীটোলা ইত্যাদি এবং এদের অস্তিত্বের কথা আজও আমাদের জানা। কলিকাতা খুব প্রাচীন শহর নয়, ফলে কোন সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই এবং লোক সংস্কৃতির মানচিত্র থেকে কলিকাতা বাদ পড়লেও সে নিজেই লোকসাহিত্যের উপাদান হয়ে আছে অনেক দিন থেকে। তাই আজকের কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, গান অনেক কিছুই রচিত হয়েছে কলিকাতাকে নিয়ে। টুসু, ভাদু, ঝুমুর গানে কলিকাতার কথা ছড়াছড়ি। কলিকাতার সংস্কৃতির তিনটি রূপ ছিল—(১) সাহেবদের সংস্কৃতি (২) এদেশীয় বাবুদের সংস্কৃতি (৩) দরিদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সংস্কৃতি। এদের মধ্যে চড়ক, গাজন, সঙযাত্রা, পাঁচালী, কথকথা, কবিগান, তরজা কপ, ইত্যাদির চল ছিল। রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় মেলা হোত, এখনও কোন কোন অঞ্চলে সে ধারা বর্তমান। বিশেষ করে টালিগঞ্জের রথযাত্রায় প্রচুর লোক সমাগম হোত। এক কথায় লোক সংস্কৃতির আনুষঙ্গিক আচার আচরণ ও পারিপার্শ্বিকতার সন্ধান পাওয়া আজও খুব কঠিন নয়। কলিকাতার লোকশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে জীবন জীবিকার তাগিদে।

কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা কলিকাতায় সঙ্গে করে এনেছে মৃৎশিল্প, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছে শোলার বা ডাকের সাজের শিল্পীবৃন্দ। এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কালিঘাটের পট ও পটচিত্র। নানা ঘটনির্মাণ, বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি সমন্বিত সরাচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি অপ্রতুল নয়।

অতি প্রাচীনকালে চব্বিশ পরগণা জেলার অধিকাংশ উপবঙ্গ বা বাঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল। তাই লোকসংখ্যার অধিকাংশই ওপর বাংলার। মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানোর উপহার স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চব্বিশটি চাকলা বা পরগণার শাসনাধিকার পায় এবং পরবর্ত্তীকালে স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। চব্বিশ পরগণার বিরাট ভূখণ্ড তখন অরণ্যাচ্ছাদিত। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে উর্বর জমিতে ফসল ফলিয়ে সহজ জীবনযাত্রার লোভে ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট দল বিচ্ছিন্নভাবে এই জেলার বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কলিকাতার মত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী জীবিকার সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়েছে এই জেলায়। ফলে এখানে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আবর্তনে যেমন এই চেহারা ও আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে তেমনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক বিবর্তনে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে বহুবার। মিশ্র সংস্কৃতির কারণ হিসাবে বলা যায় যে ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চল, ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, হালিশহরে শাক্ত, খড়দহে বৈষ্ণব, বারাসাতে নিম্ন-বর্ণের হিন্দু মুসলমান, বনগাঁর সাংস্কৃতিক জীবনে যশোহর ও খুলনার প্রভাব, সুন্দরবনের অরণ্য সংস্কৃতি আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নিম্নাংশে মেদিনীপুর থেকে আগত ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি সংস্কৃতি মিলিয়ে এক বিচিত্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে চব্বিশ পরগণায়। জেলায় তর্জাগানের বিশেষ প্রচলন আছে। **Rod Puppet Dance** ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের একটি দুর্লভ লোক সংস্কৃতির উদাহরণ। একটি ছোট লাঠির আগায় বড় আকারের কাঠের পুতুল তৈরী করে এবং নানা পোষাক পরিয়ে এই পুতুল নাচাবার ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলায় হিন্দু রাজত্বকালে বা মুসলমান রাজত্বকালে তাম্রলিপ্তির বা সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি বিভিন্ন সময়ে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আক্রমণ ঘটেছিল বহুবার। কিন্তু যতবারই আক্রমণ ঘটেছে সবগুলিই মধ্য বা দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমানের ভিতর দিয়ে হয়েছিল। ফলে নিম্ন দক্ষিণ রাঢ় বা হাওড়া বারবারই অক্ষত রয়ে গেছে। পরবর্ত্তীকালে পর্তুগীজ বা ফরাসীরাও হালিশহর-

শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া এবং কলিকাতাকে ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য মনোনয়ন করেছেন কিন্তু হাওড়াকে কখনই না। এমন কি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শুধুমাত্র মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের থেকে দূরে সরে থাকার জন্য ভাগীরথীর তীরে বসবাস করেছিল এবং উচ্চতর সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাই দেখি যে এই জেলায় উচ্চতর সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতিকে গ্রাস না করে পরস্পরের সহায়তায় পুষ্টিলাভ করেছে। লোকনৃত্য ও লোককলার ক্ষেত্রে এই জেলার দীনতা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয়। সাফল্যের প্রথম ফসল হিসাবে ঘেটু ছড়া বা বাউনি বাঁধার ছড়া প্রচলিত আছে। কিছু কিছু পটের গানও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। পটশিল্প একমাত্র লোকশিল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। পটে পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনা রঙ ও তুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শোলা ও ডাকের সাজের কদরও নেহাৎ কম নয়।

হাড়ি আঢ়া অর্থাৎ হাড়িদের বাসস্থান হাড়িয়াড়া—অপভ্রংশে হাওড়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ ছাড়া কৈবর্ত্ত, মৎস্যজীবী, বারুজীবী, তৈলিক, বাগদি, কাওড়া প্রভৃতি আদি এবং ভূমি আশ্রয়ী ও প্রকৃতি কোমগণ এই জেলার প্রধান জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচি ত।

হাওড়া জেলার লৌকিক দেবতা হলেন শিব এবং ধর্মঠাকুর। হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলে আদিম সমাজের সূর্য্যদেবতা কালক্রমে শিবে পরিণত হয়েছেন। এই জেলার বাবাঠাকুর ও পঞ্চানন্দ নামে আর ছ'জন লোকদেবতা আছেন। জেলায় অবশ্য আরো কয়েকজন দেবতা আছেন—তাঁরা হলেন ক্ষেত্রপাল, ওলাবিবি, এঁতেল বা ইতু, ঘন্টাকর্ণ, মনসা ও শীতলা ইত্যাদি।

নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামের উৎপত্তি। সেন আমলে এই নদীয়া ছিল বাংলার স্থায়ী রাজধানী, কেননা এর আগে কোন রাজাই নদীয়াকে স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত করার চেষ্টা করেন নি। তারপর ধীরে ধীরে সুবে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আবার তাদের পরে মুঘল শাসন আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সমাজ জীবন এবং সাংকৃতিক ক্ষেত্রে ঢেউ তুলবেই। বৃহত্তম বঙ্গে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মের সংঘাত লেগেছিল তার প্রতিরোধকল্পে গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণবধর্ম। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে শক্তিমতকে আশ্রয় করে নদীয়ার (কৃষ্ণনগর) রাজারা হিন্দুধর্মকে পুনর্জীবিত করে তুলেছিল। পরবর্ত্তীকালে নীলচাষ আন্দোলন,

অহিংস ও সশস্ত্র বিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলনে এই নদীয়া এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

নদীয়া জেলায় মোট জনসংখ্যার বাইশ ভাগ লোক হচ্ছে তপসীল জাতিভুক্ত আর তার অর্ধেক হোল নমঃশূদ্র। এদের মূল জীবনাদর্শ বৈষ্ণব বিদ্বেষী না হলেও সাধারণভাবে এরা হিন্দুধর্মের কতকগুলি লৌকিক উপাদানেরই ধারক। নবদ্বীপ বৈষ্ণব তীর্থ হলেও এই জেলার অন্যতম লোক দেবতা হলেন শিব। তাছাড়া খেদাই ঠাকুর, উলাইচণ্ডী, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি লোক দেবতাও আছেন।

বোলান নৃত্য নদীয়া জেলার লোক উৎসবের অন্তর্গত। গানের সঙ্গে সঙ্গে সারি বেঁধে ও বৃত্তাকারে পা ফেলে ফেলে এই নৃত্য করা হয়। আর এই নৃত্যের 'পুতুল নাচ' প্রচলন খুব বেশী এই জেলায়। কৃষ্ণনগরের তৈরী এই পুতুল-গুলিকে কাপড় ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে সূতা বেঁধে নাচানো হয়ে থাকে, তবে চব্বিশ পরগণার তুলনায় অনেক কম। লোক শিল্পের মধ্যে পড়ে মাটির তৈরী পুতুল। কেবল মূর্ত্তি নির্মাণেই নয়, সমাজ জীবনের যাবতীয় চিত্র এই মূর্তি অঙ্কনে ধরা পড়ে এবং রঙ ও গড়নে এতই বাস্তব হয়ে ওঠে যে এগুলিকে আসল জিনিষ বলে ভুল করা কিছু বিচিত্র নয়। তাঁত শিল্পে এই জেলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এককালে এখানকার তৈরী নক্সাদার তাঁতের কাপড় দিল্লী, কাবুল, ইরাক, আরব, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালীতে বিক্রি হোত। নদীয়া জেলার আর এক লোক শিল্প হচ্ছে শোলার কাজ। এই শোলার কাজ সম্ভবতঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম তৈরীর সূত্রপাত ঘটেছিল। তাছাড়া রয়েছে পুঁথির মালা, নক্সী কাঁথা, কাঠের তৈরী রথ ইত্যাদি। এগুলির মধ্য দিয়ে স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পজ্ঞান, কারুকুশলতা ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার পশ্চিম ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত এবং প্রকৃত পক্ষে তা রাঢ় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। উত্তর রাজমহল ও পশ্চিম সাঁওতাল পরগণা থেকে আদি অস্ট্রেলিয়ড বা নিষাদ সংস্কৃতির ধারা মুর্শিদাবাদের এই অংশে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত। একদিকে এই মুর্শিদাবাদেই যেমন রাঢ়ের মতই একদিন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি আবার পশ্চিম মুর্শিদাবাদে শক্তি-শৈব এবং বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে আবার মুসলমান ধর্মবিস্তারের মধ্য দিয়ে লোক সংস্কৃতির মৌলিক বৈচিত্র্য অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমন্বয় এবং

বৈচিত্র্যের মধ্যেই এই জেলার লোক সংস্কৃতির ভিত রচনা হয়েছে। এই জেলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন ভাজো পূজা বা ভাদুদেবী, ডুমনী ইত্যাদি। সূর্য্য পূজায় বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়িত রূপ এবং শৈব ধারণার মিশ্রণে এই জেলায় গাজন একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। এখানেও বোলান গানের প্রচুর প্রচলন দেখা যায়। বোলান গান চার প্রকারের—(১) ছল বোলান (২) ডাক বোলান (৩) পোড়ো বোলান ও (৪) সাঁওতালী বোলান। এই গানের উৎস হচ্ছে শিবের গাজন। আলকাপ, বাউল, মহরমের গান ও জারি গান এই জেলার এক জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত। বেরা উৎসব বা ভাসানো উৎসব মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখযোগ্য উৎসব। রেশম শিল্পের জন্য মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় রেশম শিল্পের যে সূত্রপাত ঘটেছিল আজও তার ধারা অম্লান। দেশবিদেশেও প্রচুর রপ্তানী হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতই পুরুলিয়া ঐতিহাসিক ও তৎবাহিত ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস প্রায়ই একই পথে অগ্রসর হয়েছে। কারণ গুপ্ত, পাল, সেন ইত্যাদি রাজবংশের শাসন সীমা থেকে এই অঞ্চল কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না। ফলে জৈন-বৌদ্ধ-আর্য্য-মুসলমান-খ্রীষ্টান সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাসের তরঙ্গ নানাভাবে আছড়ে পড়েছে এই জেলায়। এই জেলার বর্ণ হিন্দুরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বা বৃহত্তর ভারতের অন্য কোন অংশ থেকে বহিরাগত। বাংলার খুব কম জেলাতেই আছে আড়াই হাজার বছর আগে তৈরি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। অথচ পুরুলিয়া জেলা খুব বেশীদিনের নয়—দেশবিভাগের পর। মিশরীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে প্রাচীন মন্দিরে। এই জেলার মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন জৈনধর্মগুরুরা। চৈতন্যদেব গিয়েছিলেন নীলাচলে। বাংলায় অভিযান করেছিলেন মানসিংহ। পুরুলিয়ায় অনার্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আজও আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সারি সারি ডুংরি পাহাড়ের দেশ পুরুলিয়া একসময় ছিল বিস্তৃত জঙ্গলে ভরা—এখন আর নেই। জেলার পাহাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বেলে পাথর, অভ্র, শ্লেট, কয়লা ও লোহা। কঠিন পাথরের বুক চিরে চলে গেছে কাঁসাই নদী—পশ্চিমে সুবর্ণরেখা আর দক্ষিণে কুমারী। এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মোড়া জেলা এই পুরুলিয়া।

পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের মুখোস (চোড়দা), গালার কাজ, কেটে বা তসরের কাপড়, রূপোর অলঙ্কার, আদিবাসীদের ধামসা, মাদল উল্লেখযোগ্য। জেলাটির চরিত্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। এমন কিছু দেবদেবী

ও উৎসব এখানে প্রচলিত আছে যার সঙ্গে অন্যান্য জেলার বিশেষ মিল নেই। কুলীন দেবদেবীর সঙ্গে আছে অসংখ্য লোকদেবতা। জেলার ভূমিজ-মাহাতো-ভুঞা-বাগাল-সাঁওতাল-ওঁরাও-মুণ্ডাদের দেবতা কারসের পূজা সুপ্রচলিত। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই জেলায় ব্যাপকভাবে মনসা পূজা হয়ে থাকে। ছাতা পরব আর এক বিচিত্র অনুষ্ঠান। একটি পুকুরের ধারে বাঁশ বা পাতলা কাঠ দিয়ে ছাতা বানিয়ে ভাদ্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পালিত হয় এই উৎসব। ধামসা, ঢোল, সানাই দিয়ে চলে শোভাযাত্রা। জেলার সর্ব্বত্র অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চলে লোকদেবী টুসুর পূজা। আসলে এটি ছিল ব্রত, বর্ত্তমানে কৃষিলক্ষ্মী রূপে পূজিতা। পুরুলিয়ার উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের লোক দেবী হলেন ভাদু—ভাদ্রমাস জুড়ে হয় এই পূজা। দুটি পূজাই গাননির্ভর এবং এদের মধ্যে পার্থক্যও খুব নগণ্য। ঝুমুর পুরুলিয়ার একটি সুপরিচিত লোক সংগীত। সুরের নাম ঝুমুর। মানব-মানবীর প্রেম, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ঝুমুর রচিত হয়। তাছাড়া আছে মাঝি নাচ, কাঠি নাচ, জাওয়া নাচ, করম নাচ প্রভৃতি।

পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক জনসংখ্যার মধ্যে বর্ণ হিন্দুর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি ; ভূমিজ, মুণ্ডা, মাহাতো প্রভৃতি কুর্মিজাতি ; সাঁওতাল, ডোম এবং মল্ল প্রভৃতির বসবাস উল্লেখযোগ্য। এই জেলার অন্যতম আদি-বাসিন্দা হোল মুণ্ডা। এরা অস্ট্রিকভাষী। মাহাতো জনগোষ্টীর মধ্যে একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের প্রভাব অন্যদিকে আবার আদিম সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ভোরোস যান বা গেরাম দেবতা পুরুলিয়ার লৌকিক দেবতা। দুর্গা, কালী, বিষ্ণুর যেমন পূজা হয় তেমনি পাশাপাশি এই দেবতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইনি মৌলিক বা মিশ্র দেবতা। গ্রামের ডসীমান্তে কয়েকটা গাছের নীচে পরিষ্কার জায়গাকে গেরামথান বলে আর সেখানে পূজিত হয় বড়াম, শালুই, গ্রামবুড়ি, বুচাডারী, ঘাঘরবুড়ি, বাঘার াইন ইত্যাদি দেবতা। বলিদান এই পূজার প্রধান অঙ্গ। লোকশিল্পের মধ্যে গালার কাজের প্রচলন খুব বেশী। আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আলপনা আর আছে মাটির পুতুল বা পোড়ামাটির কাজ।

বীরভূম জেলার উত্তর পশ্চিম দিকে এক দ্রাবিড় ভাষী উপজাতি বাস করে তারা মালপাহাড়ী বা মৌরিয়া পাহাড়িয়া বলে পরিচিত। এদের একটি শাখা মালজাতি নামে বীরভূমের সমতল ভূমিতে এসে বসবাস করতে থাকে।

পশ্চিম অঞ্চলে প্রধানতঃ অষ্ট্রিকভাষী সাঁওতালদের বাস। সমগ্র বীরভূম জেলায় ডোম পর্য্যায়ভুক্ত বিরবংশী জাতির অসংখ্য লোক বসবাস করছে। ঝাড়খণ্ডে বিরহোড় নামে জাতি রয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে বির জাতিবাচক শব্দ। বিরদের ভূমি বিরভূম বা বীরভূম, যেমন মানদের ভূমি মানভূম, গোপদের ভূমি গোপভূম ইত্যাদি। বর্ত্তমানে বীরভূমে ব্রাহ্মণ, বাউরী, বণিক, স্বর্ণকার, শুড়ি, ময়রা, নাপিত, গোয়ালা, মুচি, ডোম, হাড়ি, সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা ব্যবসা ও কৃষিকার্য্য। বীরভূমের লাভপুর এক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল এবং এখান থেকেই নদীপথে বাণিজ্য চলত বলে শোনা যায়। বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত দিয়ে বয়ে গেছে অজয়নদ। এই নদীর দক্ষিণ পাড় বর্ধমান ও উত্তর পাড় বীরভূম জেলা। বৈষ্ণব-শাক্ত-মুসলমান লৌকিক ধর্মচেতনা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনার ইতিহাসই হচ্ছে বীরভূমের ইতিহাস। এই জেলায় আদিম মানুষের ক্রিয়াকলাপ ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে একইভাবে। যেমন, সেই সমাজের তুকতাক, অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ, যাদু আজও অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। বীরভূম অঞ্চলের প্রধান বাসিন্দা হোল তপসিলী সম্প্রদায়, তারা চাষবাসও করত, আবার শিকার ধরার আশায় গুহায় ওৎ পেতে বসে থাকত। তাদের প্রধান দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। ফসল ফলানো, ভূত তাড়ানো, রোগমুক্ত, অনাবৃষ্টির পরিত্রাতা হলেন এই ধর্মঠাকুর। আদিম যুগে ধর্মঠাকুরের কোন রূপ ছিল না, ছিল একখান প্রস্তরখণ্ড। মধ্যযুগে বুদ্ধিজীবী ভাববাদী ধর্মঠাকুর সৃষ্টি করেছেন। বৌদ্ধরা একে বুদ্ধদেবের সঙ্গে, শৈবরা শিবের সঙ্গে, বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং ধর্মঠাকুর সকলের কাছেই দুর্বোধ্য দেবতা। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ধর্মঠাকুর নিজস্ব রূপ কোন সময়েই ধারণ করতে পারেন নি। আদিম সমাজে বলি দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। বীরভূমের ডোমসম্প্রদায়েরা বাঁশ দিয়ে টোকা তৈরী করত এবং এতে সিঁদুর মাখিয়ে মাঙ্গল্য দ্রব্য বহন করা ও পূজা করা হোত। এই জেলায় অনেকগুলি লৌকিক দেবীর পূজা হয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশই চণ্ডী নামের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, কাটাইচণ্ডী, ধনীক্ষাচণ্ডী, পাথরাচণ্ডী, চেলাইচণ্ডী, পায়রাচণ্ডী, তাড়িকাচণ্ডী, বারাইচণ্ডী এবং বামরেয়চণ্ডী ইত্যাদি। শেষোক্ত চণ্ডীর পূজা তপসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ ব্যাপক ভাবে হয়।

সাধারণতঃ, শিলাখণ্ডে, গাছতলায় বা ধানমাঠে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রিজলী সাহেব সাঁওতালদের মধ্যে বাঘুৎ বা বাসভূতের পূজার কথা উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলের গ্রাম্য দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর একটা সম্পর্ক আছে। অন্যান্য জেলার মত ব্যাপক না হলেও এই জেলায় ভাঁদো ও ভাদুর উৎসব পালিত হয় মহাসমারোহে। বীরভূম জেলার সংস্কৃতি হচ্ছে বাউল গান ও নাচ। এ ধরণের ব্যাপক বাউল গানের আসর আজও দেখা যায়। বাউল গানে নাচ অবশ্য কর্ত্তব্য। আর আছে ঝুমুর ও লেটো গান। শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পট শিল্প, পুতুল তৈরী, কাপড় ও চামড়ায় বটিকের বা নক্সার কাজ, চীনা মাটির কাজ, এম্ব্রয়ডারী, তাঁতের কাপড়, আলপনা, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গে যখন ঘাঁটী খোঁজার কাজে ব্যস্ত, সেই সময় দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উপর আদি অধিবাসী হিসাবে যাদের গণ্য করা হোত, তারা লেপচা। কিছু সংখ্যক পরিবার বনের কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাসস্থান নির্মাণ করত। তখন সমগ্র দার্জিলিং জেলাটাই ছিল অরণ্যবেষ্টিত। জেলার লোকসংখ্যা আনুমানিক বারো হাজার। অরণ্য থেকে কাঠ, মধু, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করাই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। তীরধনুক নিয়ে হরিণ ও অন্যান্য বন্যজন্তু শিকার করত। ফিয়া দিয়েও শিকার করতে তারা পটু ছিল। নাতিদীর্ঘ একটা দড়ির এক প্রান্তে এক খণ্ড পাথর বেঁধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়াকে ফিয়া শিকার বলে। এখনও পার্বত্য অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে ফিয়া নিয়ে কেউ কেউ শিকার করে থাকেন। লেপচা ভাষা বর্ত্তমানে মৃত ভাষা। এই ভাষার কোন বর্ণলিপি ছিল না। লেপচাদের মধ্যে যারা বৌদ্ধ উপাসক ছিল তাদের মুখে মুখে উচ্চারিত কিছু কিছু প্রার্থনা, মন্ত্র ও সঙ্গীত এখনও শোনা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দার্জ্জিলিং হস্তগত করে যখন এর সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে হাত দেয় তখন উন্নততর জীবন ধারণের আশায় বহু বহিরাগত জাতি দার্জ্জিলিঙে বাস করতে আসে। এর মধ্যে নেপালী, ভূটানী ও সিকিমীরা আছেন। ফলে লেপচারা সংখ্যায় অতি দ্রুত অল্প হয়ে পড়ে।

বর্তমানে পাহাড় অংশে যে সব নেপালী, সিকিমী ও ভূটানীরা বসবাস করেন তাঁদের ধর্ম ও সামাজিক জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছে—তা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। নেপালীরা দরিদ্র। তাই জীবন ধারণের প্রশ্নে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রথম থেকেই ছিল। নেপালের মূল ধর্ম হিন্দু

হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেপালীর সংখ্যা কম নয়।

সিকিমী বা ভুটানীদের উপর ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে কম। কেননা এদের সামাজিক জীবনেও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হয়। শিক্ষা বলতে ধর্মগুরু প্রদত্ত মন্ত্রতন্ত্র, প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাদি। ধর্মগুরু সমাজের পূজ্য ব্যক্তি। কোন কোন সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারেও ধর্মগুরুদের পরামর্শ অপরিহার্য্য। নেপালীদের মধ্যে উঁচু নীচু বর্ণের শ্রেণী বিভাগ আছে। রাই, সন্ন্যাসী, ছেত্রী, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং মংগর, নেওয়ার, তামাং, লিম্বু, গুরুং প্রভৃতি তপসিলী শ্রেণীভুক্ত। যোগী, কুশলে প্রভৃতি শ্রেণী বৃত্তিগত কারণে অপাংক্তেয়। মহাভারতে কিরাত বা কিচকদের যে উল্লেখ দেখা যায় তাদের নেপালের আদি বাসিন্দা হিসাবে ধরা হয়। এদের একটি শাখার নাম লিম্বু। এরা বাস করে নেপাল-সিকিম-তিব্বত সীমান্তে গুমোরিচে জেলায়। এদের ভগবান নিওয়াবুমা ; আবার সিকিমের আদি বাসিন্দা লেপচাদের ভগবান তায়েতিং। লেপচাদের মতে এই তায়েতিং মাটি আর পাথর দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। লেপচারা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কোংলো-চু বলে জানে। 'কোংলো-চু'র অর্থ হোল বরফের সর্বোচ্চ ঘোমটা।

দার্জ্জিলিং জেলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায় এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিঙ জেলাই নয়—সমগ্র উত্তরবঙ্গেই রাজবংশী শ্রেণীর বসবাস। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত রঙপুর জেলাতেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের আদি বসবাস ছিল বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়কে মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীভুক্ত এবং মেচ নামে অভিহিত করা হয়। কৃষিকাজই রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রধান জীবিকা। জাতি হিসাবে রাজবংশী আত্মকেন্দ্রিক বলে বহির্জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েই বাস করতেন। স্বল্প উর্বর জমিতে চাষ আবাদ করে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে ভালবাসত। রাজবংশীদের জীবনযাত্রা প্রণালী খুবই অনাড়ম্বর। পুরুষেরা প্রায়শঃ ভাগোয়া বা নিম্নাঙ্গে একখানি ছোট কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করত লজ্জা নিবারণের জন্য। মেয়েরা পাটনি পরত। এখনও গ্রামাঞ্চলের প্রবীণরা পাটনিই পরে। ডোরাকাটা লুঙ্গির মত পরিচ্ছদ কাঁধের নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে পরত। বর্ত্তমানকালে রাজবংশী মেয়েরা শাড়ী ব্লাউজ পরে। রাজবংশী মেয়েরা বিশেষ ধরণের চুল বাঁধত, তাও এখন ত্যাগ করেছে। পূর্ব্বকালের অলংকারের মধ্যে

শাঁখ নির্মিত অলংকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হাতের কবজি থেকে বাহুমূল পর্য্যন্ত শাঁখের বলয় কিংবা একটি গোটা শাঁখ হাতে পরবার মত ছিদ্র করে পরা হোত। বর্তমানে শাঁখের অলংকারের প্রচলন নেই। মেয়েরা সোনা ও রূপার অলংকার ব্যবহার করে। রাজবংশী পুরুষ ও মহিলারা সমান পরিশ্রমী। ঘর ও মাঠের কাজে মহিলারা সমান অংশ গ্রহণ করে। রাজবংশী সম্প্রদায় অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। কলহ বা কোনরূপ সামাজিক জটিলতা প্রায়শঃ দেখা যায় না। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় জীবন পদ্ধতি নিয়ে বাস করতে ভালবাসে। রাজবংশীরা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না।

দার্জ্জিলিঙ জেলায় অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় নগণ্য। তরাই এর চা শ্রমিকদের সংখ্যাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চা শ্রমিকেরা জাতিতে মুণ্ডা, ওঁরাও, কোরায়া প্রভৃতি এবং এদের আদি নিবাস মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ; ফলে এরা মদেশীয় বলে সমধিক পরিচিত। এদের সমাজ ও রাজনীতি সম্পূর্ন পৃথক। এদের ধর্মবোধ নেই এবং ধর্মীয় অনুশাসন নেই। সূরয নারায়ণ বা সূর্য্য এদের একমাত্র দেবতা। শিঙবোঙা বা বীরহোড় নামে যে দেবতার উল্লেখ আছে তা বস্তুতঃ মাঠের ও বনের দেবতা। এই শহরে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যায় খুব সামান্য। তাহলেও তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া পরিচালিত মাদ্রাসা আছে। হিন্দুদের রামনবমী পূজোর অনুরূপ নেপালীরা চৈত্রমাসে দশৈ বা দেশাই পূজা ও উৎসব পালন করে থাকে। নেপালীগণ আর একটি উৎসব পালন করে থাকে সেটির নাম সাউলে বা সংক্রান্তি। তাছাড়া রয়েছে তিওর উৎসব। এই উল্লেখযোগ্য উৎসবটি সাধারণতঃ কার্ত্তিক-মাসে অনুষ্ঠিত হয়। লেপচাদের একটি পরিচিত উৎসব আছে তা নামবন নামে পরিচিত। নামবন অর্থে নতুন উৎসব—আমাদের নবান্ন উৎসবের মত। লেপচাদের মত ভুটিয়াদের মধ্যে লোসার নামে একটি লোক উৎসবের প্রচলন আছে। এই জেলার অন্যতম বিখ্যাত লোক উৎসব হচ্ছে 'দশেরা'। দশেরা নাম হলেও এটি আসলে শস্যোৎসব এবং ভারতে প্রচলিত দশেরা উৎসবের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগে যখন বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব হয় তখন কোচবিহার রাজতন্ত্রের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। তবুও দেখা যায় যে অসমীয়া যোগিনীতন্ত্রের মত অনুযায়ী আসামের বিভিন্ন অংশের জাতি ও উপজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য তাদের আচরিত রীতিনীতি সংস্কার প্রভৃতির বিবর্তনগত ধারার একটি স্রোত

বয়ে চলেছে কোচবিহারের আদি ও উপজাতিগুলির মধ্যে। কোচবিহারের প্রথম অধিপতি মহারাজাধিরাজ বিশ্বসিংহের জৈনধর্ম গ্রহণের মধ্যে এই লোক-কথার সমর্থন অনেকাংশে নিহিত রয়েছে। আসামের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কোচবিহারের আদি অধিবাসীদের সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ছাড়াও বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈবাহিক সম্পর্ক চালু ছিল তা কোচবিহারের একাধিক ইতিহাস ও রাজবংশাবলী থেকে পাওয়া যায়। কোচবিহার একদা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল যেজন্য সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শৈবমত অত্যন্ত প্রবল। তবে এই জেলায় শৈবতন্ত্রের প্রচলন কবে থেকে তার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। বর্ত্তমানযুগে রাজবংশী জাতির পৃথক কোন পরিচয় সত্বা নেই—একমাত্র "বাঙালী" এই পরিচয় ছাড়া। কেননা কথ্য ও লেখ্য ভাষা কোন্ কাল থেকে বাংলাতেই শুরু হয়েছে এবং সনাতন ধর্মের জোয়ারে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ধর্মমত প্রভৃতিতে বিবর্তন হয়েছিল তা গবেষণার বিষয়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সত্বানুসারে যেমন কোন কোন অঞ্চলের ভাষা ও রীতিনীতি ও লোকাচারের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে—রাজবংশী সম্প্রদায়কে তেমনি বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্টায়ুক্ত অখণ্ড বাঙালী সত্বার একাংশ বলে মেনে নিতে বাধা নেই।

রাজবংশী হিন্দুর মধ্যে দু'টি ধর্মমতের সন্ধান পাওয়া যায়—শঙ্করপন্থী এবং দামোদরপন্থী। শঙ্করপন্থী সাধারণতঃ শৈবমতাবলম্বী এবং দামোদরপন্থীকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় হিসাবে ধরা হয়। শঙ্করপন্থী রাজবংশীদের সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত এবং দামোদরপন্থীদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। দামোদরপন্থীদের মধ্যে যারা বৈরাগী তাদের আবার পুরোহিত শ্রেণী বা অধিকারী বলা হয়। অনেকে মনে করেন, রাজবংশীদের মধ্যে অধিকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আসামের কলিতা উপাধিধারী বৈষ্ণবদের নিকট-সম্পর্ক আছে।

কোচবিহারের অধিবাসীদের মধ্যে খেন একটি উল্লেখযোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়, যাদের উত্তরবঙ্গের অন্য কোন জেলাতেই উল্লেখ পাওয়া যায় না। খেন সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের নবশাখ সম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মাঝামাঝি সামাজিক মর্য্যাদায়ুক্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিবর্তিত অংশই খেন সম্প্রদায়রূপে কোচবিহারে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। খেন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে যেমন মাহেন্দরী,

তেলী, বারুই, শলুয়া এবং পাটোয়ারী। এই খেন সম্প্রদায় কৃষিজীবী। খেনেরা নিজেদের 'কুড়ির' পর্য্যায়ভুক্ত 'মেচ' জাতির বংশ বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের মাতৃপর্য্যায়ের সঙ্গে 'কুড়ির' সম্প্রদায়ের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। স্বল্প সংখ্যক হলেও কোচবিহারে আরও একটি জাতির অস্তিত্বের কথা জানা যায় এবং তারা মোরঙ্গী নামে সমধিক পরিচিত। চওড়া কপাল, গোলচ্যাপটা ধরনের নাকযুক্ত কোচবিহারের এই অধিবাসীরা নিজেদের ছত্রী নামে অভিহিত করে। মোরঙ্গীদের আদি উৎপত্তি স্থল যে কোথায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ইংরাজ গবেষকরা বলেন, বর্ত্তমানে পূর্ণিয়া জেলার কোন অংশ থেকে এরা কোচবিহারে বসবাসের জন্য আসে। মোরঙ্গীদের দৈহিক গঠন খুব মজবুত এবং ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি। এরা গলায় উপবীত ব্যবহার করে। এরা পূর্বে লাঙ্গলের ব্যবহার জানত না, কোদাল ব্যবহার করত। এছাড়া আছে মৈথিলী, কায়স্থ, কলিতা, নুলিয়া, বারুই প্রভৃতি জাতি। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতি তাদের সংস্কৃতি নিয়ে এসে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে তাদের পৃথক সত্ত্বা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কোচ-বিহারের লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমনি তাদের ঘিরে বিভিন্ন ধরণের নাচগান, ছড়া, পূজাপার্বণের চলও রয়েছে তেমনি প্রচুর। পূজা উপলক্ষে বড় বড় মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা থেকে আরম্ভ করে বুড়ী পূজা, কুমিরদেবের পূজা, মশাল পূজা ইত্যাদি। এদের মধ্যে শিবরাত্রি ও সিদ্ধেশ্বরী পূজা ও উৎসব কুচবিহারের অন্যতম উৎসব। পূজা-ছড়া, মেলা, আনন্দমুখর কোচবিহারে ভাওয়াইয়া গান লোকসংস্কৃতির অনেকখানি আসন জুড়ে আছে। এই গান মূলতঃ বিচ্ছেদের গান। ভাটিয়ালী সুরে দেহতত্ত্ব ও বৈরাগ্যমূলক গান গাওয়া হয়ে থাকে। সহযোগী বাদ্যযন্ত্র দোতারা। এই গানের অধঃপতিত হচ্ছে চট্কা গান। এই গানের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে লঘুকৌতুকের ভঙ্গিতে। তাছাড়া জাগগান, আবায়ণ বা রামায়ণ গান, সোণারায়ের গান (বাঘের দেবতা), মনসার গান প্রভৃতি বহুল গানের আসর বসে কোচবিহারে।

মালদহ জেলায় পূর্বে জনবসতি ছিল না বললেই চলে। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুরা এখানে কিছু কিছু জনপদ সৃষ্টি করেছে। এই জেলায় প্রাচীন মৈথিলী বংশধারার একটি আবর্তিত সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বেশীর ভাগই তাদের মধ্যে আহির বা গোয়ালা শ্রেণীভুক্ত তাছাড়াও

অন্যান্য বৃত্তিজীবীরাও রয়েছে। নূতন এসেছে পূর্ববাংলার নানা সম্প্রদায়ের লোক। এ ছাড়াও যে সমস্ত মুসলমান অধিবাসী আছে—তারা নিজেদের বাদশাহী আমলের লোক বলে দাবী করে। প্রাচীনকাল থেকে সম্ভবতঃ বাংলার রাজধানী যখন গৌড়ে স্থানান্তরিত হয় তখন থেকেই মালদহে বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতির আগমন ঘটে। যেমন পূর্ণিয়া, দিনাজপুর থেকে নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায় এসে বসবাস শুরু করে। রাজমহল, ছোটনাগপুর থেকে আসে কোল, ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়। এরা জীবিকার জন্য বেছে নেয় কৃষিকাজ, নৌকাচালনা, রেশমকীটের ব্যবসা বা পলুর চাষ প্রভৃতি। বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে যারা আসে তাদের মধ্যে মলহার, ভুঁইহার, তাঁতী, কুঞ্জরা, পাঝরা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। মালদহে মুসলমান আগমন ঘটতে শুরু করে সেন রাজত্বের পর থেকে। পরবর্তী-কালে যে সব মুসলমান এই অঞ্চলে আসে তারা ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি কিংবা ধর্মীয় উত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে নি। তারা এসেছিল আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য এবং মধ্যযুগে তারা তা সার্থকভাবেই করতে পেরেছিল বলে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। মালদহ জেলার বিখ্যাত লোক উৎসবের নাম গম্ভীরা। গম্ভীরা শৈব উৎসব। গম্ভীরা হচ্ছে নৃত্য ও ছড়া গান। এই গানের মাধ্যমে দেবদেবীর বন্দনা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এই উৎসবে ঘোড়া নাচের জন্য ঘোড়াও তৈরী করা হয়। শুধু ঘোড়া কেন, বাঁশ, কাগজ, কাপড় দিয়ে ভল্লুক ময়ূর প্রভৃতি তৈরি করে অভিনেতারা নানা রকম নৃত্য করে। কার্ত্তিকের মুখোশ পরে পিঠে ময়ূরের পুচ্ছ বেঁধে ময়ূর-নৃত্য দেখান হয়। অনেকে হনুমানের মুখোশ পরে লঙ্কাদগ্ধ পালা অভিনয় করে।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা নানা জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত। কোচ রাজবংশী পলিয়া, সাধু পলিয়া, বাবু পলিয়া, খেন, সাঁওতাল প্রভতি উপজাতিদের সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তবে দেশবিভাগের পরই পশ্চিমদিনাজপুরের বসতি পুর্নবিন্যাস সাধিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ কোচ জাতির বিভিন্ন ধারাগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে নানা সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমদিনাজপুরের কোচ ধারার উপস্থিতি ও বসতি স্থাপনের পিছনে যদিও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না; তবে মনে হয়, সপ্তদশ শতকে কোচবিহারের সঙ্গে ভুটানের সংঘর্ষের সময়ে এবং

ষোড়শ শতকে মোগল আক্রমণের সময়ে কোচ জাতির এক এক অংশ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। পলিয়ারা প্রধানতঃ মালদহের গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান-সমূহ থেকে বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লে এক অংশ এই জেলায় এসে জীবিকা অর্জন করে। সাঁওতাল এই জেলার একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। পালযুগে রামপালের আমলে ইতিহাসখ্যাত কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের সময়ে পশ্চিমদিনাজপুরের সাঁওতাল ও অন্ত্যজশ্রেণীগুলি এক সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মধ্যযুগে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে দ্রাবিড় জাতি গোষ্ঠীর বিবর্তিত ধারার একটি শাখা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে এবং সমৃদ্ধ রাজবংশের পত্তন করে, তারও অবলুপ্তির সাক্ষ্য পশ্চিমদিনাজপুরে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। অহোম রাজ্য থেকে অপসংস্কৃত একটি জাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উত্তরবঙ্গে প্রাচীন জাতির অবলুপ্তি এবং রাজবংশী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। কালক্রমে রাজবংশী সম্প্রদায়ও অন্য একটি আগন্তুক জাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে গৌড়ের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ডুয়ার্সের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে অবলুপ্তির পথে টোটা জাতি। সংখ্যায় নিতান্ত কম হলেও এদের আগমন কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত। এদের ভাষা সংস্কৃতি আচার, আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে কোন জাতিরই সাদৃশ্য নেই। এই জেলায় আরও এক উপজাতির সন্ধান মেলে তার নাম কন্টাই রাজবংশী। উত্তরবঙ্গের আর কোন জেলাতেই এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আচার আচরণে মূল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসঙ্গতি খুবই সামান্য। অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতির মধ্যে দোয়াই, গোড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাগদী জাতির সংখ্যাও নগণ্য নয়।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমদিনাজপুরের যে অংশ বর্তমানে পাওয়া গেছে সেখানে বিহার থেকে আগত হিন্দী ভাষাভাষী বিহারী, বারেন্দ্র ভূমি বা অন্যস্থান থেকে আগত বর্ণহিন্দু, কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, সদগোপ, গোপ, মালো, ভুঁইমালী, কোলকামার, কোড়া, তুরীবুলা, হাড়ি, মুণ্ডা, ওঁরাও, নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসীদের বাস। সেই থেকে বেশ কিছু মুসলমানও এখানে বসবাস করে।

অন্যান্য জেলার মত উল্লেখযোগ্য লোক শিল্প বা কলা এই জেলায় গড়ে না উঠলেও পশ্চিমদিনাজপুর বড় একটা পিছিয়ে নেই। জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ধরণের উৎসব পালিত হয়ে থাকে। যেমন কুশমণ্ডি থানায় কামব্রত উৎসব, ইসলামপুর থানায় উল্কা উৎসব ইত্যাদি। উল্কা উৎসব অনেকটা রাঢ় অঞ্চলে পালিত

বাঁধনা পরবের মত। এ ছাড়া আছে গম্ভীরা পূজা, চড়কের পূজা এবং আদি-বাসীদের মধ্যে সোহরায়, করম, জিতিয়া, ছাত্রা প্রভৃতি পরব ও উৎসব। এইসব উৎসবে পাঁচালী গানের আসর বসে। লোকসংস্কৃতিতে খন নামে এক ধরণের লোকগীতির প্রচলন এই জেলায় দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে খণ্ড থেকে খন কথাটির ব্যবহার হয়েছে। রাধা যেমন বৈষ্ণব প্রেমসঙ্গীতের উৎস তেমনি যে কোন নামের এক নারী এই খন সৃষ্টির উপলক্ষ। রাজবংশী, পলিয়া প্রভৃতি নিম্নসম্প্রদায়ের এটি প্রিয়তম গান। এই গানের সঙ্গে খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, একতারা, বাঁশী, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই গানের অনেক ক্ষেত্রই মুর্শিদাবাদের আলকাপ গানের মত।

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং গৌরবময়। আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত যে অপরূপ কৃষ্টি একদা গড়ে উঠেছিল উত্তর বঙ্গের অরণ্যাঞ্চল ও পার্ব্বত্য নদীগুলির উপকূলভাগ দিয়ে তারই মৌন সাক্ষী হিসাবে টিঁকে রয়েছে মেচ, গারো, বোড়ো, টোটো প্রভৃতি উপজাতিগুলি। যে সুদূর অতীতে রাঢ়বঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে আর্য্য গোষ্ঠী নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেই সময় এই অঞ্চলের ইতিহাস শুরু। ঠিক কোন্ সময়ে এই সব অঞ্চলে আর্য্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার কোনও প্রামাণিক ইতিহাস নেই। লোক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, প্রবাদ বচন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশাসন, লৌকিক দেবতার উদ্ভব এবং পূজাবিধি প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি বিস্ময়কর ইতিহাসের অবদান।

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসে আদি এবং অকৃত্রিম অধিবাসী হলো রাজবংশী এবং তাদের সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের অনেকেই প্রাচীন কামরূপ থেকে আগত জাতিগোষ্ঠীর ধারা। সমস্ত জাতিগুলির দৈহিক গঠনভঙ্গি, আচার-আচরণ ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ, কামরূপ, কামতাপুর প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে পানিকোচ জাতিদের দেখা যায়। যদিও পানিকোচ নামের সঙ্গে কোচজাতির সাদৃশ্যের কথা মনে হয় কিন্তু আসলে ওদের মিল গারো জাতির সঙ্গে। এরা সাধারণতঃ-অরণ্যের নিকটবর্ত্তী জায়গাগুলি পছন্দ করে এবং তাদের বাসগৃহগুলি কাঠের তৈরি। যদিও পানিকোচরা জলপাইগুড়ির মধ্যে এক বিচ্ছিন্ন জাতি হিসাবে বাস করছে তবুও তাদের এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যবহারিক

জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। খেন সম্প্রদায় এই-জেলার আর এক উপজাতি। এরূপ আর এক সম্প্রদায় হোল রাভা। এরা এই জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে বসবাস করে। রাভাদের মধ্যেও দুটি সম্প্রদায় আছে পাতি এবং রঙদানিয়া। রাভাদের মধ্যে এখন প্রচলিত ভাষা হিসাবে বাংলাকেই ধরা হয়। এই সম্প্রদায়ের দেবতাদের গ্রামঠাকুর, ধনপাল, রাখালঠাকুর, সোনা রায়, রূপা রায় প্রভৃতি লৌকিক দেবতা। সুবচনী ও চণ্ডীর নামও এই সম্প্রদায়ের দেবদেবীর মধ্যে পাওয়া যায়। কাছাড়ীরাও এইরকম একটি সম্প্রদায়। এরা চাষবাস ছাড়া নানারূপ শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জ্জন করে। আচার আচরণেও অনেকাংশে উন্নত ধরনের হিন্দুর মত। কাছাড়ীদের প্রধান দেবতা হলেন সিজু। এপরন্তু হলেন অন্ত দেবতা যিনি সমস্ত রকম ব্যাধির হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন। এ ছাড়া আছে মেচ, লেপচা, হাজং, গারো, হীরা। এরা সংখ্যায় অল্প। টোটারা এক বিস্ময়কর জাতি। জলপাইগুড়ি ছাড়া এদের সন্ধান পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। এবং অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। এদের দেবতা হলেন ইসপা। টোটাদের বারোমাসের নাম কাতি, আঘাই, পুইমাস, মামাস, পাওইমাস, চইত, বশা, জিঠ, আসু, সবাই, ভাদ্দই এবং সিংগামাস। বস্তুতঃ, এই সমস্ত মাসের সঙ্গে বাংলামাসের নামের সাদৃশ্য রয়েছে। এইভাবে বারের নাম—হিনি, জুকুং, এই, ইয়ে, বাই, দুরি, নারি। এদের বাসগৃহ নির্মাণ পদ্ধতি বিচিত্র। খুঁটির অন্ততঃ পাঁচফুট উচুতে এরা ঘর নির্মাণ করে। দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে টোটারা অনেকটা ভুটিয়াদের মত এবং পরিচ্ছদও তাই। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ভুঁইয়া, দোষাদ, খইরা, লোহার, মাহালী, মালপাহাড়িয়া, মুচি নাগেসিয়া, নমঃশূদ্র, তুরী প্রভৃতি। রায়কত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বলে পরিচিত। রায় অর্থে অধিপতি এবং কত অর্থে কোর্ট বা দুর্গ। এই দুর্গাধিপতি বা সৈন্যাধ্যক্ষ উপাধি এই বংশের সৃষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত এই জেলার লোকশিল্পকলার দক্ষতা নিতান্ত কম নয়। হলদিবাড়ী অঞ্চলে বেতের বা বাঁশের নানাপ্রকার সৌখিন ও সুদৃশ্য জিনিষ তৈরী হয়। কাপড় ও মাদুরের উপর নানাধরণের নক্সার কাজ এই অঞ্চলে দেখা যায়। এ ছাড়া রয়েছে মাটির পুতুল, মূর্তি গড়া প্রভৃতি কাজ।

তিস্তাবুড়ীকে নিয়ে গান বা মেচেনী খেলার গান এই জেলার লোককলার প্রাচীন অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শতকরা হিসাব (১৯৭১)

জিলা	প্রতি বঃ কিঃ মিঃ বসবাসের হার	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান	শিখ	বৌদ্ধ	জৈন	অন্যান্য	শিক্ষিতের সংখ্যা
বাঁকুড়া	২৯৫	৯০·৮৫	৪·৮৫	০·১২	০·০১	—	০·০৩	৪·১০	২৬·৩০
বীরভূম	৩৯০	৭০·৫৬	২৯·১৯	০·১৮	০·০১	০·০১	০·০৫	—	২৬·৫৭
বর্দ্ধমান	৫৫৭	৮২·২১	১৭·১৭	০·২৭	০·২৭	০·০১	০·০২	০·৩৫	৩৪·৩৬
কলিকাতা	৩০,২৭৬	৮৩·১৩	১৪·২০	১·৪০	০·৩৬	০·২৯	০·৬০	০·৩২	৬০·৩২
কোচবিহার	৪১৮	৭৮·৫৬	২১·২৫	০·০৮	—	—	০·১১	—	২১·৯২
দার্জ্জিলিং	২৫৪	৮১·৪৫	৩·০১	৩·৫৯	০·১৯	১১·৬৮	০·০৮	—	৩৩·০৭
হুগলী	৯১৩	৮৬·৮৯	১২·৮৯	০·০৯	০·০৪	০·০১	০·০২	০·০৬	৩৮·৮২
হাওড়া	১৬৪০	৮১·৮১	১৮·০০	০·০৮	০·০৭	০·০১	০·০২	০·০১	৪০·৫৯
জলপাইগুড়ি	২৮০	৮৬·৮১	৮·৯৭	৩·১৮	০·০৭	০·৮৯	০·০৮	—	২৪·০১
মালদহ	৪৩৪	৫৬·৬৩	৪৩·১৩	০·২২	০·০১	—	০·০১	—	১৭·৬১
মেদিনীপুর	৪০১	৯০·৬৫	৭·৭৪	০·২৩	০·০৪	০·০১	০·০১	১·৩২	৩২·৮৭
মুর্শিদাবাদ	৫৫০	৪৩·৪৬	৫৬·৩৪	০·১০	০·০১	—	০·০৯	—	১৯·৬৬
নদীয়া	৫৬৮	৭৫·৯১	২৩·৩৪	০·৭৩	০·০১	—	০·০১	—	৩১·৩১
পুরুলিয়া	২৫৬	৯২·৮৯	৪·৬৪	০·৩১	০·০২	—	০·১০	২·০৪	২১·৫০
চব্বিশ পরগণা	৬১২	৭৫·৭০	২৩·৬৮	০·৫২	০·০৫	০·০৪	—	০·০১	৩৩·৪৫
পঃ দিনাজপুর	৩৫৭	৬৩·০৭	৩৫·৮৯	০·৯৫	০·০১	০·০১	০·০৫	০·০২	২২·১২

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তপসিলী জাতি ও উপজাতি (১৯৭১)

জেলা		মোট জন সংখ্যা	তপসিলী জাতি	তপসিলী উপজাতি
বাঁকুড়া	—	২০৩১০৩৯	৫৭৩১৬২	২০৮৭৩৫
বীরভূম	—	১৭৭৫৯০৯	৫৩২৬৯৭	১২৫২৫০
বর্দ্ধমান	—	৩৯১৬১৭৪	৯৫৯৯৯৪	২২৮৬০৫
কলিকাতা	—	৩১৪৮৭৪৬	১১৮৯৬৭	২৪০৮
কোচবিহার	—	১৪১৪১৮৩	৬৬৫০২০	১০৬১১
দার্জিলিঙ	—	৭৮১৭৭৭	৯৮২৭৭	১০৮৫৮৬
হুগলী	—	২৮৭২১১৬	৫৪৮০৮০	১০০০৮৪
হাওড়া	—	২৪১৭২৮৬	২৯৭৫৭১	৩৩৬৪
জলপাইগুড়ি	—	১৭৫০১৫৯	৫৯৫৪২৪	৪২৮৫৯৫
মালদহ	—	১৬১২৬৫৭	২৬৫৬৯৭	১৩০৭১৫
মেদিনীপুর	—	৫৫০৯২৪৭	৭৪৭৪৯৭	৪৪২৯৬৩
মুর্শিদাবাদ	—	২৯৪০২০৪	৩৫৭৪১৭	৩৮৯৪৭
নদীয়া	—	২২৩০২৭০	৪৭৫৪৯৮	৩১৭৯৯
পুরুলিয়া	—	১৬০২৮৭৫	২৪০৩৫১	৩১৩৭৯৩
চব্বিশ পরগণা	—	৮৪৪৯৪৮২	১৯১০৮০৭	১৩৭১৯৭
পঃ দিনাজপুর	—	১৮৫৯৮৮৭	৪১৯৫৭৮	২২১৩১৭

শিল্পধারা ও প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাধারণভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত এবং ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে তার সংযোগও অনস্বীকার্য্য। সেইজন্য ভারত সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গ সংস্কৃতির রূপমণ্ডল বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারত সংস্কৃতির সাগর-অভিমুখে যাত্রাপথে বহু জনপদ-সংস্কৃতির বিচিত্র স্রোতস্বিনীধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বহু জাতি, উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর দান আছে তাতে। বঙ্গ-সংস্কৃতি, বাঙালীজাতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত বহু বর্ণগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। বহু জাতি উপজাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব হয়েছে। তারও আগে মৌলিক ও সঙ্কর মানবজাতির শাখা-প্রশাখার মিলনমিশ্রণ ঘটেছে বাংলাদেশে। এক একটি জনপদের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবিন্যাসের জন্য এক একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণ হয় এবং ক্রমে সেটি তার স্বকীয় সুষমায় ভাস্বর হয়ে উঠে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। পশ্চিমবঙ্গ হলো বাংলাদেশের এই রকম একটি অঞ্চল।

নানাবিধ পারস্পারিক বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘুরে চলে। তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব স্বীকার করলেও নীতি, আদর্শ ও অন্যান্য উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে তার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই ইতিহাসের বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্বরূপটি ফুটে উঠে। বাংলার সংস্কৃতি মিশ্রসংস্কৃতি এবং এর উপাদানের বিন্যাসও সর্বত্র একরকম নয়। যেমন চব্বিশ পরগণায় দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন্দ, পীর সাতবিবি বনবিবি, শাক্তদেবী, শিব-রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। ভাগীরথীর পশ্চিমে হাওড়া-হুগলী জেলায় পঞ্চানন্দ আছেন কিন্তু দক্ষিণ রায় ও বনবিবি-সাতবিবি অন্তর্হিত। আরও উত্তরে ও পূর্ব পশ্চিমে পঞ্চানন্দ প্রায় অন্তর্হিত এবং শিব সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামে গ্রামে শিবের নতুন প্রতিযোগী ধর্মরাজের আবির্ভাব এই অঞ্চল থেকে। শিব-ধর্মরাজ-অন্যান্য দেবদেবী এই প্রাধান্য ধীরে ধীরে ধর্মরাজ-শিব ইত্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে বীরভূম-বিষ্ণুপুর-ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলে। দক্ষিণ বঙ্গে পঞ্চানন্দ বনদেবতা ও বনদেবীদের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি

শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে পূজ্য। বীরভূম, বিষ্ণুপুরে ধর্মরাজ প্রধানতঃ চণ্ডীমনসার সঙ্গে বিরাজ করেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা নৈতিক, মানসিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য শিল্পকলার ক্রমাবনতি ও বিলুপ্তি ঘটতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন দেবালয় স্থাপত্যের বিকাশ হয়েছিল বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে। রাঢ়ের সূত্রধর ও গৃহশিল্পীরাই, মনে হয়, দোচালা, চারচালা, আটচালা ধরণের ইটের বাংলা-মন্দিরের রূপ দিয়েছিলেন। বাঁকা-চালখড়ের মাটির ঘরের প্রায় হুবহু অনুকরণে বাংলা মন্দির গড়ে উঠেছে। যত রকমের বাঁকা চালের খড়ো ঘর পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় ততরকমের ইটের মন্দিরও পাওয়া যায়। মনুষ্যালয়ের সঙ্গে দেবালয়ের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর শিল্পীরা। দেবতার সঙ্গে মানুষের পারিবারিক আত্মীয়তার নিদর্শন হলো বাংলামন্দির। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকাচালের গৃহের গড়ন দেখে মনে হয় রাঢ় দেশের কেন্দ্রস্থল থেকে বাংলার এই বিশিষ্ট দেবালয় স্থাপত্যের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল। প্রথমে হয়তো কাঠের ও খড়ের ঘরই দেবালয় ছিল, যেমন গ্রামে গ্রামে এখনও অনেক আছে। পরে ইটের গড়নে তাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং কাঠের কারুকার্য্য মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্য্যে পরিণত হয়েছে। তারজন্য স্থানীয় জমিদার ও সামন্তরাজার পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়েছে। ইটের দেবালয়ের যে সব নিদর্শন এখনও আছে তা থেকে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই দেবালয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। এই শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দেবালয়-স্থাপত্যে চরম বিকাশ হয়েছে এবং দেখা যায় সামন্তপোষকতা যত কমেছে স্থাপত্যের তত অবনতি হয়েছে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান তার পিছনে রয়েছে সচেতন ও পরিপক্ক বুদ্ধির প্রভাব। কিন্তু যেখানে বুদ্ধি সক্রিয় থেকেও প্রভাবিত নয় অথবা বুদ্ধি যেখানে সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ামক নয়, সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ধরা পড়ে শিল্পকলায়। অতীতের রাজা বাদশাহের কীর্তিকাহিনী এই শতকের জনজীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে, সে প্রভাব কোন ঐশ্বর্য্যের বা জনহিতকর কাজের প্রভাব নয়—সে প্রভাব হলো শিল্প ও শিল্পীর মানসলোকের প্রভাব—আন্তরিকতা আর হৃদয়াবেগের প্রভাব, কিছুটা উপলব্ধির প্রভাব। সেদিনের রাজাবাদশারা অন্যান্য কীর্তিকলাপের মধ্যে নিজেদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য-

বিশ্রাম এমন কি প্রতাপ ও প্রভাব জাহির করবার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কীর্তিসমূহ কোথায় হারিয়ে গেল! ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষত বা প্রায়লুপ্ত অবস্থায় এইসব প্রাসাদগুলি শুধুমাত্র এখন জড়গৌরবের সাক্ষ্যরূপে দেশের বিভিন্নস্থানে বিরাজ করছে। অধিকন্তু যুগের সাথে সাথে লোকের রুচিও পাল্টেছে, এতএব সে যুগপরিবর্তন রুচি শিল্পে বা শিল্পী মানসে যে আসবে তাতে, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তাই এই শতকের মানুষ দুর্গ বা প্রাসাদ নির্মাণের কথা ভাবেন না, ভাবেন অত্যন্ত আধুনিক নক্সার গগনচুম্বী অট্টালিকার কথা। কিন্তু তবুও ইতিহাস কেটে ছেঁটে বাদ দিতে পারা যায় না, ঐতিহাসিক জিনিষগুলি তাই আজও আমাদের কাছে বিস্ময়ের সামগ্রীরূপে ধরা দেয়, আর তাই অতীতের জিনিষগুলি আঁকড়ে ধরে রাখি সংগ্রহশালায়। এই সমস্ত অতীতের নির্মাণ বৈচিত্র্য পরিকল্পনা, শিল্প মাধুর্য্য আমাদের মনকে সহজেই জয় করে। এই শিল্প সম্ভার, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধিদীপ্তির এক সামগ্রিক সমন্বয়। কি অপূর্ব শিল্প প্রতিভা, কি অপূর্ব কারুকার্য্য, কি অপূর্ব শিল্পনিদর্শন!

প্রতিদিনের চলমান জীবনের কামনা-বাসনা, আনন্দ বেদনার বিচিত্র গতি-প্রকৃতির বিভিন্নরূপের প্রকাশ ঘটে এই শিল্পকলায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব বিচিত্ররূপের কালজয়ী, কালাতীতরূপকে প্রত্যক্ষ করবার কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। কালপ্রবাহকে অতিক্রম করে যারা আজও বেঁচে আছে সেই জরাজীর্ণ মন্দিরগাত্র, ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তি, আলপনা, পুতুল আর খেলনা, মনসা বা গাজীর পটচিত্র, মাটি লেপা বেড়ার বা সরার উপর রঙীন চিত্র ও নক্সা, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্য্য, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দো-চালা, চার-চালা ইত্যাদি, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে এবং বিভিন্ন প্রকার গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান।

বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস রচনা করার সময় উপাদানের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যে ক'টি প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি বর্তমান তার অধিকাংশই ভগ্ন অথবা অর্দ্ধভগ্ন। মুসলমান-পূর্ব যুগের খুব অল্প স্থাপত্যকীর্তিই আজ বর্তমান ফলে এগুলি থেকে প্রাচীন কালের সব রকমের স্থাপত্যকীর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ধারণা করা যায় না। মুসলমান-পূর্ব যুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস তাই অনেকাংশেই অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। মুসলমানপূর্ব যুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্পকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—স্তূপ

বিহার ও মন্দির। বৈদিকযুগে স্তূপ তৈরী হোত কিন্তু বৌদ্ধরাই এই স্তূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতীকস্বরূপ স্তূপপূজার প্রচলন করেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীন স্তূপের নিদর্শন হিসাবে বাহুলাড়া প্রভৃতি স্থানের স্তূপের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব স্তূপ আয়তনে ক্ষুদ্র; বৃহদাকৃতি স্তূপ বাংলা-দেশে বিরল। স্তূপের পর আসে বিহার। সুপ্রাচীনকালে পাহাড় কুঁদে বাস যোগ্য গুহা তৈরী করে বিহারে স্থাপন করা হোত। স্তূপের মতো এই বিহারও বৌদ্ধরা গ্রহণ করে এবং বিহারে থেকে বৌদ্ধভিক্ষুরা অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ধর্মচর্চ্চা করতেন। একসময় এই বিহার দুইতলা, তিনতলা এবং নয়তলা পর্য্যন্ত হোত। পশ্চিমবঙ্গের বিহারসমূহের মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি এবং মেদিনীপুরের তমলুকের ভারাহা বিহার অন্যতম। বিহারের পর মন্দির স্থাপত্যের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়, বাংলা-দেশে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া সেইসব প্রাচীন মন্দির সমূহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলায় মোটামুটি চারটি বিভিন্ন রীতির মন্দির নির্মাণ হোত। এই চারটি নির্মাণরীতি হলো ভদ্র বা পীড়াদেউল, রেখ বা শিখর দেউল, স্তূপশীর্ষ পীড়া বা ভদ্রদেউল এবং শিখর শীর্ষ পীড়া বা ভদ্রদেউল। পীড়া দেউলের একটি নিদর্শন বাঁকুড়ার এক্তেশ্বরের মন্দির, তবে সম্ভবতঃ, এই মন্দির মুসলমান আমলের। প্রাচীন বাংলার দেউল যে একসময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, স্তূপে এবং তক্ষণ ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি, চিত্র, মূর্ত্তিখোদিত ফলক ও পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলি থেকে তা জানা যায়। ভদ্র বা পীড়া নামে পরিচিত এই মন্দিরই উড়িষ্যার রেখ মন্দিরগুলি সম্মুখভাগের জগমোহন। কিন্তু বাংলার পীড়ার সঙ্গে জগমোহনের তফাৎ এই যে জগমোহনের চাল ক্রম হ্রস্বায়মান পোতল বিভক্ত পিরামিডাকৃতি হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং তার আমলক-শিলার তলায় ঘন্টাকৃতি একটি অংশ থাকে, অন্যপক্ষে বাংলার পীড়ায় এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। রেখ বা শিখর দেউলে গর্ভগৃহের চাল ঈষৎ বক্ররেখায় শিখরাকৃতি হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। শিখরের উপরে থাকে আমলক ও চূড়া। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, অবিভক্ত বাংলারও প্রাচীনতম নিদর্শন, সম্ভবতঃ, বরাকরের চার নম্বর মন্দিরটি। অন্যান্য প্রাচীন রেখ দেউলের মধ্যে বর্দ্ধমানের দেউলিয়া গ্রামের মন্দির। বাঁকুড়ার বাহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও দেহার গ্রামের ষাঁড়েশ্বর ও মল্লেশ্বর মন্দির ও সুন্দরবনের জটার

দেউল। কোন কোন অংশে উড়িষ্যার রেখ দেউলের সঙ্গেও বাংলার এসব মন্দিরের আত্মীয়তা বর্তমান, আবার পশ্চিম-ভারতের নাগর দেউলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে, বরাকরের ৪ নং মন্দিরের "কনকেভ" আমলকের সূক্ষ্মাগ্রধারসমূহ, মন্দিরের উর্দ্ধাংশের রাহাপগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলকসমূহ, রাহাপগ বিভাজক নিরবচ্ছিন্ন রেখা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। নাগররীতিতে নির্মিত আঞ্চলিক সংস্করণের মন্দিরগুলির মূল শিখরের চার পাশে ছোট ছোট কতকগুলি শিখর থাকে। এই শিখরগুলিকে অঙ্গ শিখর বলে। অঞ্চল বিশেষে অঙ্গ শিখরের গঠনরূপেরও পার্থক্য হয়। বাংলাদেশের এ জাতীয় মন্দিরেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান; বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ও সুন্দর-বনের জটার দেউলের অঙ্গশিখরের স্বকীয়তা লক্ষণীয়। বরাকরের মন্দির এবং দেহারের দুটি মন্দির পাথরের তৈরি। অন্যান্য রেখ দেউলগুলি ইটের তৈরী। এই সব স্থাপত্যকীর্তির গাত্রালঙ্কারসমূহ পরিচ্ছন্নতা এবং নিখুঁত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে; অঙ্গ-অলংকরণ হিসাবে এদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। স্তূপশীর্ষ এবং শিখর শীর্ষ পীড়া দেউলের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অস্বাভাবিক আকৃতির এ ধরণের মন্দির বাংলাদেশেই নির্মিত হয়েছিল এবং এখান থেকে বহির্ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এ দুই রীতির প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এই রীতির প্রচলন যে বাংলায় ছিল, বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি চিত্র তার প্রমাণ। এই নির্মাণশৈলী অনুযায়ী চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রস্বমান ঢালুচালের স্তরের উপর একটি বড় স্তূপ থাকত এবং প্রত্যেকটি স্তরের চার কোণে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ অলঙ্করণ হিসাবে খোদিত হোত। স্তূপ শীর্ষ পীড়া দেউলের মত শিখর শীর্ষ পীড়া দেউলেরও কোন বাস্তব নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এ ধরণের মন্দির বাংলাদেশে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার প্রমাণ ভাস্কর্য্য ও পাণ্ডুলিপি। শিখর শীর্ষ পীড়া দেউলে ক্রমহ্রস্বায়মান চালের সর্বোচ্চটির উপর একটি শিখর এবং শিখরের উপর আমলক শিলা থাকত। বৌদ্ধ মন্দির হলে আমলক শিলার উপর একটি স্তূপ স্থাপিত হত।

হিন্দু যুগের মতো মুসলমান যুগেও বিভিন্ন প্রকারের মন্দির তৈরী হয়েছিল। স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এই সমস্ত মন্দির পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—রেখ দেউল, চালা দেউল, বাংলা মন্দির, রত্ন মন্দির এবং শিখর যুক্ত আট কোণাকৃতি মন্দির। এছাড়াও, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে এক নতুন রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময়ে রেখ দেউলে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত

হয় নি—পূর্বেরই অনুরূপ বরাকরের এক, দুই, তিন নম্বর মন্দির, কাগড়ের মন্দির, ইচ্ছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতির রেখ দেউল উল্লেখযোগ্য। চালামন্দির সাধারণতঃ দোচালা, চারচালা, আটচালা হয়ে থাকে। দোচালা বা আটচালা মন্দির বাংলায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায় এবং বর্ধমানের গোরুইতে চারচালা মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা মন্দির দু রকমের—এক বাংলা ও জোড় বাংলা। এক বাংলা মন্দিরের কোন নিদর্শন নেই। জোড় বাংলা মন্দির বর্তমানে গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যমন্দির, বিষ্ণুপুরের মন্দির। উড়িষ্যায় এ ধরণের মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিকে গৌড়ীয় বা বাংলা রীতি বলে। বাংলার নিজস্ব এই মন্দির স্থাপত্যরীতি রাজপুত এবং মুঘল স্থাপত্যরীতিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলার এই দান উপেক্ষণীয় নয়। রত্নমন্দির প্রধানতঃ পঞ্চরত্ন এবং নবরত্ন। নবরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর দেখা যায় এবং মন্দিরের তলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রত্ন বা শিখর গুলি সংখ্যায় তেরো, সতেরো, একুশ, পঁচিশ পর্য্যন্ত হয়ে থাকতে পারে। মুর্শিদাবাদের রাণী ভবাণীর মন্দির গঠন রীতিতে শিখরযুক্ত আটকোণাকৃতি। এ ধরণের মন্দির পশ্চিমবাংলায় খুব একটা নেই বললেই চলে।

মোটামুটিভাবে বাংলার স্থাপত্যরীতিকে আরও সংক্ষেপে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ নিজস্ব, মিশ্র এবং বহিরাগত। নিজস্ব পদ্ধতি—চালা জাতীয় মন্দির ; মিশ্র—রত্ন শ্রেণীর মন্দির এবং বহিরাগত হচ্ছে কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, আর্য্যভারতীয়, মুসলীম এবং ইউরোপীয় পদ্ধতিকে বোঝায়।

ভারতীয় স্থাপত্য নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়-শৈলী স্বীকৃত। কিন্তু পুরোপুরি-ভাবে তার কোনটাই বাংলাদেশে অনুসৃত হয় নি। আবার উড়িষ্যায় যে নাগর শৈলীর বৈশিষ্টা তা যে বাংলাদেশকে স্থাপত্যশিল্পে প্রভাবান্বিত করে নি এমনও নয়। মেদিনীপুর খুব নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য উড়িষ্যার প্রভাব অনস্বীকার্য্য অর্থাৎ সুউচ্চ শিখর-সংলগ্ন জগমোহন, সামনে নাটমণ্ডপ, ভোগমণ্ডপ, একাধিক উপমন্দির ও প্রাকার বেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গন সেখানে খুব বেশী। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে দূরত্ব যতই বেড়েছে এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ততই কমেছে। বাঁকুড়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হওয়ার জন্য বাংলারীতির প্রাধান্য বেশী। আরও দূরের জেলা হাওড়া, হুগলী চব্বিশপরগণা, বর্ধমানে উড়িষ্যা রীতির প্রতিফলন খুবই কম এবং তফাৎ বীরভূম, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদে নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে খিচিং-এর মন্দিরগুলির গঠনরীতির

সাদৃশ্য দেখে অনেকেই অনুমান করেন যে খিচিং এর রীতিই পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল। পুরী, ভুবনেশ্বরে সুউচ্চ শিখর সমন্বিত বিমানের সঙ্গে জগমোহন নাটমণ্ডপ প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে এবং সমস্ত দেবালয় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। খিচিং-এ সেরূপ নয়, পশ্চিমবঙ্গেও নয়। সুউচ্চ পোতার উপর বিমান বা মূল মন্দির গর্ভ গৃহের উপর প্রসারিত শিখর—এই পদ্ধতিতেই খিচিংএর মন্দিরগুলি তৈরি। বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ এবং দক্ষিণ পীশ্চমবাংলার অনেক মন্দির একই রীতিতে নির্মিত। আর. পি. চন্দের মতে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে, খিচিং-এ তা অনুসৃত হয়েছিল, খিচিং-এর মন্দির নির্মাণের কাল দশম শতাব্দীর এদিকে নয়; অপরদিকে সরসীকুমার সরস্বতী বলেন যে বরাকরের বেগুনিয়া মন্দিরের নির্মাণকাল একাদশ শতাব্দী এবং বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকাল দশম শতাব্দীর আগে নয়।

কোন স্থানের মন্দির বা ইমারত তৈরীর রীতি ও প্রস্তুতি অনেকাংশে নির্ভর করে কি ধরণের উপাদান সেই স্থানে অথবা কাছেপিঠে পাওয়া যায় তার উপর। ভারতের অন্যত্র পাথরের সৌধ যত বড় ও বেশী আকারে দেখা যায়, বাংলাদেশে তা হতে পারে নি তার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে সেখানে পাথরের নিতান্তই অভাব। পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে কিছু কিছু নিকৃষ্ট ধরণের পাথর পাওয়া গেলেও তা পরিবহনের ব্যয়বাহুল্যের জন্য সংগ্রহ করে সৌধ বা মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একমাত্র রাজারাজড়া এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের তা কল্পনাতীত। শ্বেতপাথর তো দূরের কথা, সামান্য বেলেপাথর সংগ্রহ করার জন্য রাজমহল ও চুনারের শরণাপন্ন হতে হয়। গ্রানিট প্রভৃতি কঠিন জাতীয় পাথরের স্থায়িত্ব ও ভারবহন ক্ষমতা যে পোড়ামাটির ইটের অপেক্ষা অনেক বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। সেজন্য বাঙালী কোনদিনই পুরীর জগন্নাথ বা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত সুবিশাল সৌধ গড়ার কথা চিন্তা করে নি। বাংলা দেশে ইটের তৈরি ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় কয়েকটি আজও বর্তমান আছে যেমন সুন্দরবনের জটার দেউল, মেদিনীপুরের হটনগর শিবের মন্দির, বাঁকুড়ার বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির, বর্দ্ধমানে দুটি দেবালয়, পুরুলিয়ার পাড়া ও দেউলঘাট বড়ামের তিন চারটি মন্দির। প্রাকৃতিক কারণে এবং বস্তু অভাবজনিত বাঙালী স্থপতিরা স্বল্পস্থায়ী ভঙ্গুর ইট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন বলে ইমারত পরিকল্পনার কঠোর ভাবকে তাদের সংযত রাখতে হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পকলা আর্য্য-অনার্য্যের সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি যেমন প্রথম শতকে ইউচি-শক-কুষাণ, দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে হূণ, তাদের নিজেদের সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে ভারত-বর্ষের বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বুকে সংস্কৃতির ছাপ দেখা না গেলেও ভিতরে ভিতরে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শের রূপান্তর ঘটেছিল অন্ততঃ শিল্পে ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে তার ইতস্ততঃ প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অষ্টম শতক থেকে ভাস্কর্য্য প্রাচীর ও অন্যান্য শিল্পে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অন্য দিকে এই শতকে ক্লাসিকাল সংস্কৃতির অবসানের ফলে স্থানীয় লোকায়ত শিল্প নিজেকে ব্যক্ত করার অপূর্ব্ব সুযোগ পায়। এই রূপান্তরের আর এক অর্থ ক্লাসিকাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। প্রাচীন বাংলাদেশে কিন্তু আর্য্য সংস্কৃতির ঘনিষ্ট স্পর্শ খৃষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে লাগে নি। কেননা তদানীন্তন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় নি। তবে তার আগে রাঢ়, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজদের ঐতিহ্য, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষের একধারে পড়েছিল আর্য্যমনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতায়। ভারতবর্ষে প্রথম পাথর কুঁদা আরম্ভ হয় মৌর্য্য আমলে বা তারও কিছু আগে, এবং সেই শিল্প বাংলাদেশে পৌছাতে আরও কয়েক শো বছর লেগেছিল। গুপ্ত-পর্ব্বের আগে কিছু কিছু পুরাতাত্বিক নিদর্শন বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশীর ভাগ পোড়ামাটি যার ফলে অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সুন্দরবনের কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তিটিতে মার্জ্জিত রসবোধ ও আধ্যাত্মচেতনা দীপ্ত। এই মূর্ত্তিটিতে গুপ্তশৈলীর যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, বাংলায় প্রাপ্ত আর অন্য কোনটিতে এত সুস্পস্টভাবে ধরা পড়ে না। মুর্শিদাবাদে ঝালার গ্রামে চক্রপুরুষের একটি মূর্ত্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলের প্রতিমারূপের যে রূপান্তর পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় চব্বিশ পরগণার মণির হাট গ্রামের একটি শিবমূর্ত্তিতে।

এই শতকে আরও যে পনেরোষোলোটি মৃৎফলক পাওয়া যায় সেগুলি স্থূল, গুরুভার গড়ন, ও একটিতে গতিময়তার আভাষ থাকলেও তার আড়ষ্টতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়ায় না। গুপ্তশৈলীর অপরূপ সূক্ষ্ম রেখা এবং নমনীয়তার কোন চিহ্ন নেই। এগুলিতে পাল আমলের ফলক রচনা বিন্যাসের পূর্বাভাষ যেমন

সুস্পস্ট, তেমনি গুপ্তশৈলীর মার্জিত রূপের সঙ্গে এদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সপ্তম-অষ্টম শতকের মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের প্রায় সমস্তই পূজার্চ্চ-নার জন্য তৈরী দেবদেবীর মূর্তি; এদের নির্মাণ ও রচনা বিন্যাস একান্তভাবে প্রতিমা লক্ষণশাস্ত্র অনুযায়ী। সভ্যতার প্রারম্ভেই জৈনধর্মের প্রথম ঢেউ বাংলা দেশে এসে পৌঁছালেও খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম নাগাদ এ ধর্মের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়, তার প্রধান কারণ পালরাজবংশ ধর্ম বিষয়ে উদার মতাবলম্বী। হিন্দু হলেও তারা বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। তাছাড়া, খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থান বাংলাদেশে জৈনধর্মের অবনতি ঘটায়, তবে সেন আমলে জৈনধর্মের চর্চ্চা যে একেবারেই ছিল না এমন নয়।

পাল ও সেন আমলে বাংলার শিল্পকলা যেরূপ রাজাদের বা বিত্তশালী ব্যক্তি-দের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তা অন্যান্য শতকে সম্ভব হয়নি। পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশেরও সহায়ক ছিলেন, কিন্তু সেন রাজবংশ পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই যুগে প্রতিমা শিল্পের রচনা বিন্যাসে এবং দেহভঙ্গীতে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার আবেদন, দেউলে ও গঠনে ইন্দ্রিয়পর ইহমুখিতার আকর্ষণ। খৃষ্টাব্দ ৭৫০-১২৫০ পর্য্যন্ত সমস্ত শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত। প্রতিমা শাস্ত্রের দিক থেকে এদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, শিল্পের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক। পাল পর্বের আগে প্রস্তুত ভাস্কর্যের নিদর্শন বাংলাদেশে খুব একটা নেই। যে কয়েকটি নিদর্শন অবশিষ্ট আছে তাতে সন-তারিখ উৎকীর্ণ না থাকার জন্য এদের গঠন ও রূপ বিশ্লেষণ ছাড়া কাল নির্ণয়ের জন্য কোন উপায় নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাল সেন পর্বের সমস্ত মূর্তিই সুক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কষ্টি পাথরে তৈরী। ধাতব মূর্তিগুলি পিতল অথবা অষ্টধাতুতে গড়া; সোনা ও রূপার তৈরী দু'একটি মূর্তি পাওয়া যায়। এই পর্বের মূর্ত্তিকলায় যে ভঙ্গ ও ভঙ্গী এবং মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার বীজ উপ্ত হয়েছিল গুপ্ত পর্বের শিল্পকলায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত মুসলমানেরা বন জঙ্গলে ঘাঁটি না গাড়লেও তার শিল্পনীতি বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। গুহামন্দির ছাড়া প্রাচীনতম ভারতীয় দেবালয়গুলিতে চারিদিকের দেওয়াল কিছু দূর অবধি তুলে, তাদের শীর্ষে লম্বা লম্বা পাথরের

পাটা আড়াআড়ি ভাবে রেখে ছাদ তৈরী হোত,—এই রীতিটি গুপ্তযুগের কিছু কিছু মন্দিরে এখনও দেখা যায়। মুসলমানী আমলে খিলান ও গম্বুজের নির্মাণ প্রথায় উৎকর্ষ দেখা যায়। দু'এক বছরের মধ্যে হিন্দু শিল্পীরা এ বিদ্যা আয়ত্ব করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে খাড়া দেওয়ালের চারকোণে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় লহরার বিন্যাস করে তার উপর বৃত্তাকার গম্বুজের মূল স্থাপন করা চলে। শুধু তাই নয়, প্রতিস্তর ইট ধাপে ধাপে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গম্বুজের চারিদিকে বৃত্তাকার দেওয়ালকে এক শীর্ষ বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে তাদের খুব একটা অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। এ ছাড়া, ঢাকা বারান্দাগুলিতে ছাদ ও গর্ভগৃহের ছাদও যে খিলানের উপর স্থাপিত হয়েছে তাও মুসলীম রীতি প্রভাবিত। প্রবেশ পথের খিলানগুলির চোখা কৌনিক গড়ন ও ফুলকাটা স্তরবিন্যাস এবং আটকোণা থামগুলির গঠন প্রকরণে মুসলমানী প্রভাব পড়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে বাংলাদেশের বহু অধুনাতন ইটের মন্দিরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলংকরণ যে অব্যবহিত পূর্ব্বের মুসলীম রীতি দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে পোড়ামাটির ব্যবহারের ঐতিহ্য বহুকালের হলেও মধ্যযুগের শেষ দিকে এ শিল্পের চর্চা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশে। সেজন্য বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ভাস্করদের এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টি সমকালীন ভারতবর্ষে তুলনাহীন।

খৃষ্টীয় তেরো শতকের প্রথমে অর্থাৎ মুসলীম আর্বিভাবের পরবর্ত্তী দু'শো বছরে বাংলাদেশে সম্ভবতঃ খুব কম মন্দিরই তৈরি হয়েছে। মুসলীম ইমারতের গঠনরীতি থেকে সবচেয়ে উপকৃত হন হিন্দু স্থপতিরা, কেননা হিন্দুযুগে পোড়া-মাটির সজ্জা প্রকরণে তাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও মাঝখানে যখন মুসলীমরা হাত দিলেন তখন জ্যামিতিক ও ফুলপাতা নক্সা এক নূতন রূপ নিল। কঠিন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য মুসলীম শিল্পীরা নরনারীর এমন কি পশুপাখির মূর্ত্তি রচনা করতে পারেন নি। দেবদেবীর কথাতো স্বতন্ত্র। কিন্তু হিন্দু ভাস্করদের হাতে পড়ে টেরাকোটায় মরা গাঙে বান এলো। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর স্থান ঘটল এই সব টেরাকোটায়। যদিও প্রাকৃতিক কারণে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তবুও যে কয়েকটি আছে তা দেখলে মনে হয় উচ্চমানের দক্ষতা ও কলাকৌশলে সেগুলি তৈরি। বাঙালীর অন্দরমহলের বিবিধ ঘরোয়া ছবিও বাদ পড়ে নি। পাশাখেলা, উৎসব, পার্ব্বণ, কন্যাসম্প্রদান, বধূবরণ,

সাজসজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র অনুশীলনও টেরাকোটা শিল্পীদের অজস্র চিত্ররূপের সন্ধান দিয়েছে। অপসৃত সমাজ জীবনের যেগুলি, সেগুলি যে মূল্যবান আলেখ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার প্রাচীনতম যে সব নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এবং প্রত্যেকটাই পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ তালপাতার বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি বা অলংকরণোদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। ছবিগুলি যদিও ছোট তবুও সুক্ষ্ম, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ, ভাব কল্পনার পরিধি বিস্তৃত ও গভীর, রঙের বিন্যাসও প্রশস্ত। চিত্রবিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্য্যের রীতি অনুসরণ করেছে। ছবিগুলিতে যে সব রঙ ব্যবহার করা হোত তার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়ি মাটির সাদা, গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরের লাল এবং সবুজ। মূলগত আদর্শের দিক থেকে এই চিত্রশিল্প বাঘ-অজন্তা-ইলোরার গুহার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই ব্যাপারে সুন্দরবনে পাওয়া ডু'সেট তাম্রপটে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে মন্দিরের যে কয়েকটি রূপ ও রীতির কথা আলোচনা করা হলো তা বহির্ভারতে বিশেষ করে ব্রহ্মদেশে ও যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই মনে হয়, বাংলাদেশই এইসব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

বাংলার মূর্ত্তিকলা ভারতের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি যে অসংখ্য মূর্ত্তি আবিষ্কার হয়েছে তার অধিকাংশ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার কোন মূর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পাথরের মূর্ত্তির অস্তিত্ব ভারতবর্ষের তাম্র প্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশে মাটিতে গড়া মূর্ত্তির প্রাধান্য প্রাচীন কালেও খুব বেশী ছিল। কাঠের কারুকার্য্য খচিত মূর্ত্তির উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়। এ থেকে বাংলাদেশে সেকালে মাটির ও কাঠের মূর্ত্তির প্রচলনও খুব বেশী ছিল বলে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায় যে বাংলাদেশে মূর্ত্তিকলার অস্তিত্ব থাকলেও পালপূর্ব যুগের প্রস্তর নির্মিত মূর্ত্তি অল্পই পাওয়া যায়। প্রাচীন মূর্ত্তিগুলিতে কোন রকম সন বা তারিখ উৎকীর্ণ না থাকলেও কাল নির্ণয়ের জন্য মূর্ত্তিগুলির গঠনপ্রণালীর বিভিন্ন ভঙ্গীর সাহায্যে ওগুলির কাল নির্ণীত হয়েছে। মূর্ত্তি গঠনে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা থেকে সন

তারিখের কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও গঠন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলিই মূর্ত্তির কাল নিরূপণে সহায়তা করে। বাংলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ধারাকে যুগ অনুযায়ী মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন হিন্দু, মুসলিম এবং বৃটিশ। হিন্দু যুগের প্রারম্ভে যে সমস্ত ধারাগুলি প্রচলিত ছিল আজ তার অধিকাংশ লোপ পেয়েছে। প্রকৃতি এই দেশে কেবল উর্বশীই সাজে নি, সর্ব-সৃষ্টির ধ্বংসকারিনীর ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। অনেকের ধারণা, পাথরের মন্দির হলে তা হয়তো প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেত, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। ইটের তৈরী সৌধও যে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকতে পারে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলায় ভিতগাঁও এর হিন্দু মন্দিরটি ইটের তৈরী এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর। মধ্যপ্রদেশের খারোদ ও সিরপুরে কয়েকটি ইটের মন্দির আছে যাদের প্রতিষ্ঠা-কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর। ইটের তৈরী খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দুটি স্তূপ পাওয়া গেছে সোলাপুরে তের নামক স্থানে এবং অন্ধ্রের চেজারালাতে, কিন্তু বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যদি অনুরূপভাবে এই সব অঞ্চলে ঘটত তা হলে ঐ সমস্ত মন্দির এবং স্তূপগুলির অবস্থার যে বিপর্য্যয় ঘটত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং দোষটা উপকরণের নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতির। ইটের মন্দিরকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য বাংলার শিল্পীরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি, প্রকৃতি তাদের উপর সদয় হননি।

বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রকৃত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের যথাযথ সূচনা হয় মুসলীম যুগে। কেননা এই যুগেই বাংলার মন্দির শিল্পীরা মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেন। যদিচ মুসলীম প্রকোপে বহু হিন্দু মন্দিরের অকাল পতন ঘটেছে এবং কোন কোন স্থানে সেই ভিত্তির উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তবুও একথা বলতে বাধা নেই যে এতদিন পর্য্যন্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে ধারাগুলি তারা অনুসরণ করে এসেছেন তা ভিন্ন প্রদেশাগত, কিন্তু এবার তারা যে পথে অগ্রসর হলেন তা একান্তভাবেই স্বদেশের। এই কালে মন্দির স্থাপত্যের যে বিশেষ ধারাগুলি বিস্তৃতি লাভ করে তাদের উৎস এবং উৎপত্তিস্থল বাঙ্গালীর সনাতন গৃহ। বহিরাগত স্থাপত্য প্রভাবের অনুপ্রবেশ যে এর পর ঘটেনি, তা নয়, কিন্তু বাংলার এই নবজাত অথচ বলিষ্ঠ স্থাপত্যকে তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। আরও অনেক পরে এই দেশে আগত ইউরোপীয়দের নিকট তার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছিল। একদিকে যেমন বিদেশাগত গ্রীক ও গথিক স্থাপত্য ভারতে অনুপ্রবেশ করল তেমনি অপরদিকে বাংলার

নিজস্ব গৃহনির্মাণ শৈলী বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত হয়ে এক স্থাপত্যগত তথা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরাজদের দ্বারা নির্মিত "ডাক বাংলার" উৎস হোল বাংলার সেই সনাতন বাসগৃহ। মন্দির শিল্পের যে অংশটিতে ইউরোপীয় প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা হোল অলংকরণ বা ভাস্কর্য্য। মন্দির অলংকরণে চূণ-বালি ও চূণ-সুরকির ব্যবহার আদি বা মধ্যযুগের জানা ছিল না এমন নয়, কিন্তু ইংরেজদের আগমণের পর থেকেই এই ত্রিবিধ উপকরণের ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করল এবং পোড়ামাটি শিল্পের পতনের পর মন্দির সজ্জার জন্য শিল্পীরা আশ্রয় করলেন এই উপকরণগুলিই। মন্দির গাত্রে চূনের মসৃণ প্রলেপ দিয়ে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় তা পোড়ামাটির অলংকরণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। প্রলেপ দান ছাড়াও চূণের সাথে সুরকি বা বালি জমিয়ে মনুষ্যমূর্ত্তি, জীবজন্তু, পুষ্পস্তবক, লতাপাতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তুকে মন্দিরের গায়ে উপস্থিত করলেন শিল্পীরা। ইউরোপীয় সৌধসজ্জার সুপ্রচলিত বিষয়গুলি যেমন ঝুলন্ত পুষ্পমালা (ফেস্টুন), কুণ্ডল (পেনডাণ্ট), ঢাল (মনোগ্রাম) ইত্যাদি সযত্নে সন্নিবিষ্ট হোল।

আর একটি বিষয়ে বাংলার শিল্পীরা এই যুগে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটি হোল মন্দিরের গায়ে মিথুনের বহুল ব্যবহার। মন্দিরে মিথুনের ব্যবহার ভারতে সুপ্রচলিত ছিল, বিশেষ করে হিন্দু যুগে। পূর্ব পাকিস্তানের পাহাড়পুরের মিথুনের দৃশ্য দেখে একথাই মনে হয় যে ঐ সময় পশ্চিমবাংলায়ও মিথুনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মুসলিম যুগেও মিথুনের ব্যবহার হয়েছে মন্দিরে কিন্তু সেখানে কৃষ্ণলীলার একটা আধ্যাত্মিক আবরণ থাকায় কাম ও সংযমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশ যুগে নির্মিত পোড়ামাটির মন্দিরে মিথুনের যে সব উদাহরণ দেওয়া আছে তা দেখে মনে হয় যে শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে পুরুষ ও নারী যেমন প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ভিতর ও বাহিরের অস্তিত্ব ভুলে যায় তেমনি প্রাণপুরুষ মহিমময়ের সাথে মিলিত হয়ে জাগতিক সুখ-দুঃখের বন্ধন মুক্ত হয়, তার আকাংক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে তখন সে আর কিছু চায় না, কোন বেদনা স্পর্শ করে না। মিথুনের ব্যবহার তার মূল কারণ থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে যখন একটা নিরস প্রথাগত অলংকরণে পরিণত হোল তখন এলো বিকৃতি। সমাজের দুর্নীতি যতই বাড়তে থাকে এই বিকার ততই বেড়ে চলে

তাই বৃটিশ বাংলার মন্দিরে মিথুন দৃশ্যের নায়ক-নায়িকারা পুরুষ ও প্রকৃতি নন, তারা সমকালীন সমাজের পুরুষ ও নারী।

বাংলাদেশের পোড়ামাটির কাজ বস্তুতঃ নূতন। মুসলমানেরাই পোড়ামাটির অলংকরণের রীতি ও নকশা সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। ১৪শ শতক থেকে ১৫শ শতাব্দীতে মসজিদ এবং সমাধি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা পোড়ামাটির শিল্পকে নিয়ে গেছেন বহিরঙ্গ স্থাপত্যের কাছাকাছি—সূক্ষ্মভাবে খোদাই, সুদীর্ঘ বন্ধনের মধ্যে বিস্তৃত, দেওয়ালে কারুকার্য্য এবং খিলানের উপর কুলঙ্গিসদৃশ প্যানেল। বিষয়বস্তু একজোড়া গোলাপ, ঝুলন্ত বাতি, পদ্মবৃন্ত, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি। এই ধরণের সজ্জাবিশিষ্ট প্রথম মন্দির হচ্ছে মেদিনীপুরের ঘাটালের সিংহবাহিনী মন্দির (১৪৯০ খৃষ্টাব্দ) কিন্তু পোড়ামাটির কাজ তাতে সামান্য। পরের মন্দিরগুলি—মূর্শিদাবাদের গোকর্ণ (১৫৯০), হুগলীর বৈঁচিগ্রাম (১৫৮০) কিংবা বর্দ্ধমানের বৈদ্যপুরে (১৫৯৮) পোড়ামাটির ফলকে অলঙ্কৃত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের যে সব মন্দিরে পোড়ামাটি অলংকরণের প্রাচুর্য্য দেখা যায় তাদের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং অলঙ্কারগুলিও বহুলাংশে বৈষ্ণব। মন্দিরের নিম্নভাগে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসের মৃত্যু পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা, প্রবেশ পথের উপরে বড় বড় ফলকে বিধৃত যুদ্ধক্ষেত্রের পরিব্যাপ্ত দৃশ্য ; রাম-লক্ষ্মণ-বানরসেনার সঙ্গে রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ এবং অন্যান্য অংশে বিষ্ণুর দশাবতার, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রায়শই দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে দেখা যায় সারি সারি খোলবাদক ও উন্মত্ত নৃত্য শিল্পীর মেলা এবং এই সব মূর্ত্তির ছন্দোময় উচ্ছ্বাসেই যেন প্রথম যুগের পোড়ামাটি শিল্পের সুরটি বেজে উঠে। মুঘল আমলে পোড়ামাটির অলংকরণ যখন মসজিদ থেকে মন্দিরে ছড়িয়ে পড়ল, বাংলাদেশের মুসলীম স্থাপত্য জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে দিল্লী থেকে বাদশাহী রীতি নীতি আমদানী করল। পোড়ামাটি ছেড়ে ধরল চক্‌চকে প্লাষ্টার, বাঁকানো কার্ণিশ ত্যাগ করে গ্রহণ করল সোজা কার্ণিশ।

উপরোক্ত দৃশ্যাবলী ছাড়াও কৌতুককর অনেক ঘটনার সমারোহ মন্দিরের গায়ে দেখা যায়। সেগুলি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সরল ও স্পষ্ট। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের পিছনে নীচের সারিতে রাজারা সমস্ত ভৃত্যবর্গের সামনে নবাবী আরামের আমোদজনক আতিশয্যের ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ইংরাজ সাহেবদের সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে, কোমরে হাত দিয়ে আদেশকারীর

ভঙ্গিতে বসে পাইপ টানতে ব্যস্ত, স্থূলকায় কুম্ভকর্ণ বিশাল গদা চালনা করছে এবং খুবই তাড়াতাড়ি বানর সৈন্যদের গিলে খাচ্ছে। এ ছাড়া ঢেঁকি পৃষ্ঠে নারদ, মনসা, শীতলা ও অন্যান্য লৌকিক দেবতারও উপস্থাপনা করা হয়েছে। পোড়ামাটির শিল্পশৈলীকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। সময়ের দিক থেকে প্রথম যুগ (১৬ থেকে ১৭ শতক পর্য্যন্ত), মধ্যযুগ (১৮ শতক) এবং পরবর্ত্তী যুগ (১৯ শতক)। প্রথম যুগের অলংকরণগুলি বলিষ্ঠ, ঋজু এবং ছন্দোময়। মুখগুলি সাধারণতঃ পাশ থেকে দেখানো হয়েছে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শক্তিমত্তায় স্ফীত। যেমন বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি—শ্যামরায়, জোড়বাংলা; বীরভূমের ঘুরিমার শিবমন্দির, পুরুলিয়ার চেলিয়ামার রাধাবিনোদ মন্দির, হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় বাসুদেব মন্দির, নদীয়ায় দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দির। অষ্টাদশ শতকে কিন্তু পূর্ব্বের শতকের বলিষ্ঠতা অনেক শিথিল হয়ে যায় এবং উনিশ শতকে ইউরোপীয় প্রভাবে দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। মূর্ত্তিগুলি গোলাকার হোল, বলিষ্ঠতা বিলুপ্ত হোল, সজীবতা নষ্ট হয়ে গেল এবং গতিতে শৈথিল্য দেখা গেল। আঠারো শতকে সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি ছিল যে রীতির তাকে হুগলী রীতি বলা যেতে পারে এবং এই রীতি আশে-পাশের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রীতির মন্দিরগুলি সাধারণতঃ আটচালা কখনও বা পঞ্চরত্ন, তিনটে খিলান করা দরজার উপরে চাল দেওয়া, যুদ্ধদৃশ্য অলংকৃত, নীচে সমসাময়িক দৃশ্যাবলী এবং উপরে কৃষ্ণলীলা। এই মন্দিরের নিদর্শন হুগলীর জয়নগর, কোটালপুর, সাহাগঞ্জ, রাজবলহাট প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায় এবং হুগলীর বাইরে মেদিনীপুরের মালঞ্চ ও দেবীচকে, বীরভূমের কেন্দুলীতে, মুর্শিদাবাদের বড়নগরে এবং বর্দ্ধমানের কিছু কিছু গ্রামে। এই শতকের শেষ দিক থেকেই মন্দিরের সামনে প্রতিষ্ঠাফলক রাখার স্পৃহা দেখা যায়। উনিশ শতকে আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ হয়। যেমন মেদিনীপুরের শৈলী, বীরভূম বর্দ্ধমানের শৈলী, বাঁকুড়ায় শৈলী ইত্যাদি এবং বিভিন্ন জেলার মধ্যে এইসব শৈলীর মিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। এই শতকের শেষ দিকে পোড়ামাটির কাজের চলন কমে আসতে থাকে এবং তার জায়গায় ষ্টুকোর কাজ এলো যেমন দক্ষিণেশ্বরে (২৪ পরগণা)। পোড়ামাটির কাজ যে একেবারে ছিল না তা নয় তবে সেগুলি ছিল স্থূল ও উদ্দেশ্যবিহীন এবং এইভাবেই বিশ শতক পর্য্যন্ত টিঁকে রইল। প্রাক্ মুসলীম যুগের কয়েকটি ইটের মন্দির—সুন্দরবন অঞ্চলে জটা, বর্দ্ধমানের সাত দেউলিয়া, বাঁকুড়ায় বাহুলাড়া ও সোণাতপল, পুরুলিয়া জেলার বড়ম্। সেগুলিতে

কীর্ত্তিমুখ, চৈত্য গবাক্ষ বা দোলানো মালার অনুকৃতি এবং নানাবিধ ফুলকারি জ্যামিতিক নকশাই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। পাল আমলের প্রথম দিকে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্যে পশুপাখি, নরনারী, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ফুলকারি নকশার বহুল প্রয়োগ দেখা গেলেও ঐ যুগের শেষে মূর্ত্তি ভাস্কর্য্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। চৈতন্যদেবের আর্বিভাবে ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের সর্ব্বত্র অগণিত ইটের মন্দির তৈরি হয়েছিল এবং মুসলীম যুগে যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্য অবরুদ্ধ ছিল তার দ্বার পুনরায় খুলে গেল। সঙ্গে এলো রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা। তারপরের শতকে কিন্তু এর মধ্যে সামাজিক বিষয়বস্তুর স্থান মিলল। যেমন শিকার দৃশ্য, পুরনারীদের প্রসাধন, কন্যাসম্প্রদান ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ সামাজিক বিষয়বস্তুর অঙ্গ হিসাবে মিথুন ভাস্কর্য্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক কালে স্থাপত্যরীতির পরিবর্ত্তন না ঘটলেও অলংকরণের ক্ষেত্রে টেরাকোটার পরিবর্ত্তে হাল্কা পঙ্খের সজ্জা দেখা গেল এবং চালা রত্ন বা দেউল মন্দিরের পরিবর্ত্তে দালান মন্দির নির্মাণ করার ঝোঁক হোল।

স্থাপত্যের দিক থেকে দাঁতন, কেশিয়াড়ি, ওগরা, কর্ণগড়, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা (মেদিনীপুর), আঁটপুর, বল্লভপুর, বাঁশবেড়িয়া, মহানাদ (হুগলী), বৈদ্যপুর, কালনা, গৌরাঙ্গপুর, বরাকর (বর্দ্ধমান), দেউলভিড্যা, এল্যাটি, ধরাপাট, ডিহর, বিষ্ণুপুর, বাহুলাড়া, সোণাতপল, (বাঁকুড়া), কলেশ্বর, ডাবুক, কবিলাসপুর, বক্রেশ্বর, ভাণ্ডীরবন (বীরভূম), বড়ম, তেলকুপি, পারা (পুরুলিয়া), মেল্লক (হাওড়া), জটা, মন্দিরবাজার, বেড়াচাঁপা (২৪ পরগণা), চাকদহ, শান্তিপুর, শিবনিবাস, (নদীয়া), বড়নগর, পাঁচথুপি (মুর্শিদাবাদ) এবং জলপাইগুড়ির পূর্ব্ব ডহর ও জল্পেশ্বরের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্য্য বিচারে মেদিনীপুরের মাংলোই, ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর, হুগলীর আঁটপুর, রাজবলহাট, গুপ্তিপাড়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি ; বর্দ্ধমানের বরাকর, কালনা, মানকর, হাটগোবিন্দপুর, মৌখিরা, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, আকুই, বীরভূম-জেলার ঘুড়িষা, ইলামবাজার, সুপুর, উচকরণ, সুরুল প্রভৃতি পুরুলিয়ার চেলিয়ামা ও পারা হাওড়ার সুলতানপুর, অমরাগড়ি, ঝিকিরা, নদীয়ার চাকদহ, দিক্‌নগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগর, গোকর্ণ, পাঁচথুপি এবং পশ্চিমদিনাজপুর জেলার বিন্দোলের মন্দিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগে অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে দালান মন্দিরের স্থাপত্য ও সজ্জায়

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পর্তুগীজদের আবির্ভাবে ইউরোপীয় প্রভাব বাঙালীর জনমানসে যেটুকু পড়তে বাকি ছিল ইংরাজদের দেওয়ানী লাভে তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। দালান মন্দিরের আয়নিক স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষে চৈত্য গবাক্ষ; দেওয়ালে ভিনিসীয় দরজা ও অর্দ্ধ উন্মুক্ত দ্বার প্রান্তে প্রতীক্ষারতা যুবতী প্রভৃতি এই বিদেশী ভাবধারার ফলশ্রুতি। তবে এ ধরণের সংকর প্রণালী বঙ্গদেশে খুব একটা বেশী ঘটেনি।

স্থাপত্যশিল্প ছাড়াও আর এক ধরণের শিল্প আছে তার নাম লোকায়ত শিল্প বা লোকশিল্প। সমাজ গঠনের প্রথম থেকেই মানুষ মাটির দেওয়ালে যে সব লেপ্য চিত্র ও আলপনা এঁকেছে, মাটির কাঠের পুতুল, পট ও পাটা, গৃহকর্মের ও উৎসবের সময় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈরি করেছে তা শিল্পের স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। লোকায়ত শিল্পের উৎস হচ্ছে জনগণের গোষ্ঠীগত অবচেতন মন। কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সত্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে অবশ্যই সেই জাতির লোকায়ত শিল্পের সন্ধান করা দরকার।

লোকশিল্পের জন্ম লোক বা জনসমাজ বা ফোক এই ইংরাজী শব্দের অর্থে সেই জনসমাজের প্রয়োজনে। লোকশিল্পে জন্ম ও বিস্তৃতি হয়েছে নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, লোকাচার, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি নিত্যকর্মের প্রয়োজনে। পশ্চিমবঙ্গে লোক শিল্পের মধ্যে রয়েছে (১) কাঠের খোদাই করা কাজ, কাঠের পুতুল, বারকোষ, কাঠের পিঁড়ি ইত্যাদি (২) মাটির পুতুল, মূর্ত্তি, প্রতিমা, মাটির হাঁড়ি, কলসী, সরা ও ঘট (৩) শোলার সাজ, ডাকের সাজ, চাঁদমালা ঝরা, ইন্দ্রজাল, কদম-পুতুল (৪) নক্‌সী কাঁথা, রুমাল কাঁথা, লেপ কাঁথা, বই-এর মলাট, খাবার ঢাকা দেওয়ার কাঁথা, বটুয়া (৫) কাঁসার বাসন-পত্র থালা, ঘড়া, গেলাস, রেকাবী, ঘটি, জামবাটি, ইত্যাদি (৬) নানা ধরণের মাদুর, শীতল পাটী, মসলন্দ মাদুর (৭) নানা প্রকারের পট-পারলৌকিক চিত্রাবলী, একক চিত্র ও গোটানো পট বা Scroll (৮) পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল, ঘোড়া, হাতী, বাঘ, ষষ্ঠীপুতুল, বঙ্গাবঙ্গি। (৯) শাঁখা ও সামুদ্রিক শাঁখের বিচিত্র গহনা, হাতীর দাঁতের কাজ, মোষের সিংয়ের ও হাড়ের কাজ, রেশমী ও সূতা কাপড় শিল্প ইত্যাদি।

রীতি, আঙ্গিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বাংলার চিত্রশিল্পকে সাধারণতঃ দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মার্গ শিল্প—প্রাচীন যুগে পালশৈলী, মধ্যযুগে মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রশৈলী ও আধুনিককালে ইউরোপীয় চিত্রকলার

অনুকরণে আঁকা ছবি (২) লোকশিল্প—এর অভিব্যক্তি পুঁথিপত্রে, পুঁথির মলাটে আঁকা রঙীন চিত্রে, পটচিত্রে, চালচিত্রে, আলপনায়, দশাবতার তাসে, পোড়া-মাটির চিত্রিত হাঁড়ি, কলসী, ঘট ও লক্ষ্মীসরায়। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অসংখ্য পুঁথি লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল। চিত্ররীতি, বর্ণানুলেপন, মূর্ত্তি বিন্যাসে, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপস্থাপনে এবং রেখার ব্যবহারে চিত্রগুলি সজীব। বিষয়বস্তু ফুল, লতাপাতা, গাছ, পাখি, মেঘ। এ ছাড়াও, রামায়ণ গ্রন্থের কিছু কিছু দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে (মহিষাদল) ঘন রঙয়ের হাল্কা রেখার বেষ্টনীর মধ্যে ঘন নীল, সবুজ, গোলাপী, মেটে লাল হলুদ প্রভৃতি রঙের প্রয়োগে চিত্রগুলি গতিশীল। চিত্রিত পুঁথির সংখ্যা কম হলেও বাংলাদেশে পুঁথির চিত্রিত মলাটের সংখ্যা কম নয়। পালযুগের এমনি কতকগুলি মলাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। পালযুগের পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বহু চিত্রিত মলাটের সন্ধান মেলে যার উপর কৃষ্ণলীলা, রাধাকৃষ্ণের ছবি, রামায়ণের অনেক বিষয়বস্তু চিত্রিত। মুঘল যুগে পাণ্ডুলিপির চামড়ার মলাটে সোনালী রঙের ফুল পাখি, গাছের ডিজাইন থাকত। পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পের একটি অন্যতম আকর্ষণ। আবহমান-কাল ধরে পট চিত্রণ আমাদের দেশে চলে আসছে। ধাতু ঢালাই বা পাথরে ক্ষোদিত চিত্রকলার তুলনায় রঙতুলির শিল্প সম্ভারের আয়ু যেহেতু কম এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বিনাশহেতু প্রাচীন চিত্রিত পট দেখার আশা আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে দশম শতাব্দীর পরে অর্থাৎ পাল এবং পালোত্তর যুগের চিত্র নমুনা দেশে ও বিদেশে কিছু কিছু সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। পালযুগের পূর্ব্বে চিত্র সম্পর্কে আমাদের সাধারণতঃ দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রথমতঃ, পুরাতাত্ত্বিক খনন ও দ্বিতীয়তঃ লিখিত সাহিত্য। পাল সাহিত্য থেকে শুরু করে মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মুদ্রারাক্ষস, হর্ষচরিত, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি সকল প্রাচীন সাহিত্যে চিত্রায়িত পটের উল্লেখ আছে। এমন কি, প্রাক্ বৈদিকযুগের শীলমোহর অন্যান্য পুরাণ সামগ্রীতে পটচিত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থের চিত্রপ্রাচুর্য্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের চিত্রের ধারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ মন্দির দ্বারা বারে বারে প্রভাবিত হয়েছে। লোকপ্রিয় লোককলা পট চিত্র ও তার ধারাকে যুগ-যুগান্ত ধরে অটুট রাখতে পারে নি। নানা রাজ্যের শিল্প শৈলীর প্রভাব যেমন

তার উপর পড়েছে তেমনি অন্যান্য রাজ্য ও বঙ্গীয় চিত্র শৈল্পী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

পট ও পুথির অলংকরণ ভারতশিল্পের ইতিহাসে পালযুগের অনন্য অবদান বলেই স্বীকৃত হয়েছে। এই সময় থেকেই ভারতে অনুচিত্র বা miniature painting শুরু হয়। কালীঘাটের পট, যমপট, জড়ানো পট এ সব হচ্ছে আলেখ্য চিত্রণের ও প্রাচীর চিত্রণের লোকায়ত পদ্ধতি। শিল্পী যা দেখেছে এবং সমকালীন লোকসংস্কৃতিতে যা প্রতীত হয়েছে, এ সব তারই রূপায়ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়মুখী। পটচিত্র ও জড়ানো পাটা যারা অঁাকত তাদের বলা হোত পটুয়া। পাটায় চিত্রায়িত হোত কাহিনীর বিস্তার—জাতকের চিত্রাবলীর মত। কালীঘাটের পটচিত্রণের পূর্ব্বসূরীর অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পাল-সেন ও পরবর্ত্তী শতাব্দী সমূহে নির্মিত বাংলাদেশের মন্দিরের পোড়ামাটির টালিতে। কালীঘাটের পটের চিত্রভঙ্গিমা কিছুটা গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অঁাকা ব্যঙ্গচিত্রে পাওয়া যায়। মুসলীম ও ইংরাজ যুগসন্ধিক্ষণে কালীঘাটের পটের সূচনা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে এর অবলুপ্তি। কালীঘাটে যাওয়ার পথের দু'পাশে শিল্পীদের অঁাকা চিত্রগুলি বিক্রী হোত যেমন মাছ-কুটুনী, বাঙালী-গিন্নি, দাঁড়ে বাঁধা কাকাতুয়া, বিলাসী ফুলবাবু, পটের বিবি, গড়গড়ার নলমুখে সাহেব ইত্যাদি। কৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, শিবগৌরী সংবাদ; বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী—প্রধানতঃ এইসব জড়ানো পাটায় অঁাকা হোত। গুজরাটী ও রাজস্থানী চিত্রে যেমন মানুষের মুখের একদিক দেখা যায় তেমনি বাংলার পটচিত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। আশুতোষ মিউজিয়ামে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এই-ধরণের কয়েকটি চিত্র সংরক্ষিত আছে। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে অঁাকা কয়েকটি পটচিত্রে জয়পুরী চিত্র পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি পটচিত্রে মুঘল চিত্ররীতির প্রভাব রয়েছে।

তেলরঙা ছবি আঁকার কৌশল আমাদের দেশে ইংরাজ আমলের আগে প্রচলিত ছিল না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেই সময় ভাগ্যান্বেষণে কিছু সংখ্যক ইংরাজ চিত্রকর এদেশে এসেছিলেন এবং তারাই এদেশে তেলরঙা ছবির গোড়াপত্তন করে। জোফানি কর্ত্তৃক ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর একটি আলেখ্য এবং ভেরেস্ সার্জ্জন কর্ত্তৃক জয়পুরের যুবরাজা হাতীর পিঠে চেপে শোভাযাত্রার অপূর্ব্ব তেলরঙা ছবি আজও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শোভিত। বিদেশী

শিল্পীদের আঁকা বিষয়বস্তুর মধ্যে ভারতীয় নানাবিধ পশু, পাখী, শহরের দৃশ্য, কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য বা আলেখ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপীয় রীতিতে তেলরাঙা চিত্র ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথম এঁকেছেন রাজা রবিবর্মা। তাঁর ছবিগুলি—রামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধন, হরিশচন্দ্র, শকুন্তলা, রাবণ ও জটায়ু, ফুলওয়ালী প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও সেগুলির মধ্যে গভীর শিল্পবোধের পরিচয় ছিল না। তবে তা পরবর্ত্তী শিল্পীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। ড্রইং-এ সতীশ সিংহের মত নিখুঁত কাজ সব দেশে সব সময়ই দুর্লভ। দৃশ্য বস্তুর আকৃতি ও বর্ণ সূর্য্যের আলোয় যে কত রকম রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তা তার ছবি না দেখলে বোঝা যায় না। গভীরত্ব পরিস্ফুট করতে তিনি অসামান্য ছিলেন। ওকাকুরার পরামর্শে প্রাচ্য (চীন জাপান প্রভৃতি) এবং পাশ্চাত্য শিল্প ধারার সন্ধান ও অনুশীলন করে ভারতীয় শিল্পালোকে গগণেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ তৈলচিত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। কালি, তুলির ব্যবহারে, ছায়াছবি অঙ্কনে, ছবির বিস্তৃতি বিশ্লেষণে, জ্যামিতিসিদ্ধ চিত্র রচনায়, ব্যঙ্গচিত্রে গগণেন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প সমাজে অদ্বিতীয়। তাঁর আঁকা ছবিতে সাধারণ মানুষ, নানা রকমের পশুপাখী প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, ভারতমাতা শাহজাহান, ওমর খৈয়াম, জেবউন্নিসা, পারাবত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চিত্রগুলিতে মুঘল পদ্ধতি সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাঁর আঁকা কচ ও দেবযানী, আকাশ-বিহারী যক্ষ-দম্পতি, চাঁদের আলোয় জলসা ছবিতে জাপানী প্রভাব বিশেষ পরিস্ফুট। তাঁর ছবিতে ভারত, ইউরোপ এবং জাপানের বৈশিষ্ট্য-সমন্বয় প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে সমস্ত শিল্পী-গোষ্ঠীর আবিভ'াব ঘটেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক হয়েছেন যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, রামকিঙ্কর বেজ, মুকুল দে প্রভৃতি। ইণ্ডিয়ান পেন্টিং নামে যে অঙ্কন ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক হলেন নন্দলাল বসু। আধুনিক কালের ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম যাঁর উপর ভারতের বাইরের কোন শিল্পরীতির বা শিল্পীর প্রভাব আসতে পারে নি। নন্দলালের আঁকা ছবিতে প্রধান লক্ষণীয় যা, তা হোল অঙ্কিত বস্তুর ভাস্কর্য্যসুলভ গড়ন। তাঁর আঁকা ছবি—শিবের ধ্বংসলীলার নৃত্য, শিবের বিষপান, উমার দুঃখ এবং পার্ব্বতীকে কোলে নিয়ে শিবের নীরব শোক। তাঁর সতীর সহমরণ চিত্র সারা বিশ্বের প্রশংসা লাভ

করেছে। রঙের অকৃপণ ব্যবহার এবং অত্যধিক সংযম দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে অবনীন্দ্রনাথের সার্থক শিষ্য করে তুলেছে। টেম্পেরা বা জলরঙা চিত্রে ওয়াশ (wash) পদ্ধতি প্রয়োগে তিনি অদ্বিতীয়। ভাস্কর্য্যসুলভ গড়ন, গভীরতা এবং সুডৌলতা তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতে পরিস্ফুট। ভুসো কালি, গুঁড়ো খড়ি, লতাপাতার রস, গেরি মাটির মিশ্রণে তৈরি রঙ ব্যবহার করতেন আধুনিক কালে প্রথিতযশা শিল্পী যামিনী রায়। 'টেম্পেরা' ধরণের চিত্র আঁকতে এইসব উপাদানের ব্যবহার প্রচলিত। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেও যামিনী রায় সম্পূর্ণ স্বদেশী—শিশুকে কোলে করে মা, লাঙল হাতে চাষী, কীর্ত্তন গায়ক, সাঁওতাল নাচ, বারব্রত ও পূজায় রত গ্রাম্য মেয়ে। উড়িষ্যার পটচিত্র, গুজরাটী চিত্র, কালীঘাটের পট, বাঁকুড়ার পাটচিত্র—এদের সঙ্গে যেন কোথায় যামিনী রায়ের আঁকা ছবির আত্মিক মিল রয়েছে অথচ এদের থেকে কৌশলে, রঙের বিন্যাসে ও বিষয়বস্তুতে একেবারে পৃথক জাতের। সাত্ত্বিকতা এবং গড়নের ডিজাইন তাঁর চিত্রে পরিস্ফুট। আপন স্বকীয়ত্বে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত। পিকাসো পরিমিত রেখায় বস্তুর অন্তর্নিহিত গড়ন ও রূপকে ভেঙে জ্যামিতিক বিন্যাসের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। পিকাসো গড়ন বা ফর্মকে ভাঙলেও শিল্প ব্যাকরণ থেকে বিচ্যুত হন নি। কিন্তু রবীন্দ্র চিত্রাবলী জ্যামিতিক রেখা সমষ্টি নয়, গড়নকে ভাঙা নয় এবং শিল্প ব্যাকরণ সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নয়। তাঁর চিত্রে contour নেই, কমনীয়তাও অনুপস্থিত। এমন কি তিনি যে সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন তার সঙ্গে সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে কোনরকম মিল না থাকলেও ছবির ভেতরকার প্রচণ্ড গতি ও শক্তিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিবাহ, ব্রত, পূজা পার্ব্বণ, ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আলপনা অপরিহার্য্য। রামের বিবাহে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়, সুভদ্রার বিবাহে, শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের বিবাহে আলপনার উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাতে মেনকাকে আলপনা নৃত্য করতে হয়েছিল। রামপ্রসাদ নিজহাতে কালীর আলপনা আঁকতেন, রামকৃষ্ণও অবসর সময়ে আলপনার চর্চ্চা করতেন। প্রাঙ্গণে, দেবগৃহে, ধানের গোলায়, ধনভাণ্ডারে এবং সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনার ব্যবহার আজও সমানভাবে চলে আসছে। আলপনাকে লেপ্যচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলপনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ ধানের শীষ, ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পা, শাঁখ, লতাপাতা, জলের ঢেউ প্রভৃতি। আলপনা শুধু যে বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ তা নয়, ভারতের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে আলপনার ব্যবহার

হয়ে থাকে। যেমন গুজরাটে রঙগরী, রাজস্থানে মেহেন্দী মাড়ন, উত্তর-প্রদেশে চৌকা পূরণা, বিহারে এঁপন এবং উড়িষ্যায় চিন্তা। বিবাহে শুধু ভূমিতেই আলপনা আঁকা হয় না হাঁড়ি, সরা, কুলো, পিঁড়ি প্রভৃতিতেও আলপনা আঁকা হয়। বিবাহের আলপনায় বহুদল পদ্ম, শঙ্খলতা ও জ্যামিতিক নক্সার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আলপনা দিতে দিতে নানা ছড়া ও গানও গায় মেয়েরা। আলপনা হচ্ছে মনের কামনাকে রূপ দেওয়ার বাহ্যিক আকৃতি। বৃত্তাকার, চৌকা, ত্রিকোণ প্রভৃতি অবয়ব তার। মাটির দেওয়ালে আলপনা দেওয়া আদিবাসী সমাজের অবশ্য কৃত্যের মধ্যে পড়ে।

মানব সভ্যতার একটি শাখা স্থানীয় সভ্যতার পরিচয় জ্ঞাপক ধারা হিসাবে বাংলাদেশেও একদা পুতুলের জন্ম হয়েছিল। মেদিনীপুরে তমলুক, বাঁকুড়ায় পোখরণা ইত্যাদি অঞ্চলে যে সব খননকার্য্য হয়েছে সেখানে অনেক পুতুল পাওয়া গেছে। অনেক পুতুল আঙুল দিয়ে টিপে তৈরি; এদের মাথা চ্যাপটা, নাক পাখির ঠোঁটের মত। হাত পায়ের আদল আছে, কনুই, হাঁটু, বা আঙুল ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে। গা নগ্ন, চোখ আর অলংকরণের জন্য ফুটকি বসানো। বেশীর ভাগই পোড়ানো, তবে পোড়াবার তারতম্যে গায়ের রঙের তারতম্য দেখা যায়। মাটির পুতুল ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে পিতলের ঢালাই পুতুল, পাথরের পুতুল, কাগজমণ্ডের পুতুল, সর বা ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদিও তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া হাতির দাঁত, বেত, বাঁশ ও মোষের শিঙের পুতুল দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে মোট ছয় রকমের পুতুল পাওয়া যায়। (১) ক্ষুদ্রায়তন দেবদেবী মূর্ত্তি—যেমন কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কালী ইত্যাদি (২) মনুষ্যমূর্ত্তি—আহ্লাদী, মা-ছেলে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বউ, বেয়ান-বেয়াই ইত্যাদি (৩) পশুমূর্ত্তি—নানারূপ পশু ও পাখী, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, গণ্ডার, মাছ ইত্যাদি (৪) 'যো' পুতুল মানুষের মূর্ত্তি কিন্তু বিশেষ আকৃতির; নিচের অংশ পরিস্ফুট নয়। প্রধানতঃ, মেদিনীপুর জেলায় এই পুতুলের প্রচলন অধিক। (৫) নাচিয়ে পুতুল বা মাথা নাড়ানো পুতুল (৬) ঘর সাজানো পুতুল ইত্যাদি। মাটির পুতুলের উপকরণ হোল আঠালো কাদা আর রঙের মধ্যে ভূষো, গেরিমাটি, মেটে সিঁদুর, এলামাটি, খড়িমাটি, তুঁতে, আলতা, কাজল, লাক্ষা ও নীল। মুর্শিদাবাদের পুতুলের গায়ে অভ্রের রঙ লাগানো। পুতুল তৈরীর প্রয়োজনীয় রঙ ও তুলি শিল্পী দেশজ উপায়ে নিজেরাই বানায়। বীরভূম, বাঁকুড়ার পুতুল একটু লম্বা ধরণের এবং সরু বাঁকানো

নলের মত হাত। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এক বিশেষ ধরণের পুতুল হোত। মূর্ত্তি স্বাভাবিক অথচ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তৈরি হয়ে আসছে। লাঙ্গল কাঁধে চাষী, মুচি, সাপুড়ে, জমিদারবাবু, বণিক, বরকন্দাজ, পাইক, নৌকা, নানারকমের ফল ও খাদ্যদ্রব্য, মাছ, পাখি, টিকটিকি, আরশোলা ইত্যাদি। পশ্চিম বাংলার মাটির তৈরি খেলনা ও পুতুল শিল্প নানাদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। এ রাজ্যের এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে মাটির পুতুল খেলনা শিল্প গড়ে উঠে নি। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলের মাটির দেবদেবীর পুতুল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এসবের মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক ও স্থানীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি। সংখ্যায় অবশ্য পৌরাণিক দেবদেবী এবং রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবীর সংখ্যাই অধিক। একই ধরণের মূর্ত্তি যদিও সব অঞ্চলেই কমবেশী দেখা যায় তবুও তাদের রঙ এবং আকার আকৃতি আলাদা। রঙ-এর কাজ সূক্ষ্ম। মূর্ত্তিগুলিতে লাল, হলুদ, হাল্কা নীল, কালো ও সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। বহু পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে লক্ষ্মীর পুতুল সব অঞ্চলেই কমবেশী দেখা যায়। কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী, শিব প্রভৃতির মূর্ত্তিও প্রচুর প্রচলিত। লক্ষ্মীর এক হাতে ঝাঁপি অন্য হাতে পদ্ম। দেবীর বাহন পেচক বেশ স্পষ্টভাবে চিত্রিত। আর একটি সাধারণ এবং সার্ব্বজনীন মাটির পুতুল হোল গণেশ জননী। ষষ্ঠীপুতুলের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মেয়েদের ষষ্ঠীব্রতের সঙ্গে যুক্ত বলে লৌকিক দেবী ষষ্ঠী সব জায়গাতেই পূজিতা। এক বা একাধিক সন্তান কোলে দণ্ডায়মানা বা উপবিষ্টা ষষ্ঠী পুতুলের মধ্যে লোকশিল্পের চরিত্র পুরোপুরি বর্ত্তমান। বাঁকুড়ায় নানাধরণের ষষ্ঠীপুতুল দেখা যায়। প্রথমে আঙুলে টেপা পরে সুরু কাঠি দিয়ে চেরাই করা চোখ, হাত পায়ের আদল সমেত পুতুলের নজীর প্রচুর আছে। ছাঁচে গড়া পুতুলের আবিষ্কার হয়েছে আরও পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সময়ে। তারও পরের পুতুলের মধ্যে পাই নানা শৈলীর আবির্ভাব। পশ্চিম-বঙ্গে পুতুল তৈরির নানা ঘরণার জন্ম হয়েছে এরপর। বীরভূমে রাজনগরের পুতুলের সঙ্গে তাই মেদিনীপুরের নাড়াজোলের, বাঁকুড়ার পাঁচ মুড়ার, চব্বিশ পরগণার জয়নগর, মজিলপুরের, মালদহের হরিশচন্দ্রপুরের মাটির পুতুলের তফাৎ দেখি। অন্যান্য লোক শিল্প সম্পর্কে এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। মুর্শিদাবাদের কাঁটালিয়ায় হয় অভ্রের পুতুল, মাটির পুতুলের গায়ে অভ্রের গুঁড়ো ছেটানোর অপূর্ব কাজ। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুরুলিয়ার দীপাবলী

পুতুল উৎসবকে কেন্দ্র করে লুপ্তপ্রায় এই শিল্পধারাকে আজও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। পশুপাখী, নারীপুরুষ ঘোড়সওয়ার, প্রদীপবহনরতা নারী প্রভৃতি পুতুলের রূপ সর্বাধিক প্রচলিত। এই সমস্ত মৃৎশিল্পীদের আদি নিবাস ছিল গয়া বা হাজারিবাগ অঞ্চলে এবং দু'তিন পুরুষ আগে এরা মানভূমে আসে। পুতুল গড়ার পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। মৃৎশিল্পীরা শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে প্রাথমিক আকার গড়ে তোলে। রোদে শুকিয়ে প্রথমে খড়ি গোলা সাদা রঙ লাগানো হয়, পরে বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ করা হয়। তবে শরীরের বিভিন্ন অংশ শুধুমাত্র আভাষে বোঝানো হয়। নারী-পুরুষ মূর্ত্তির ক্ষেত্রে শরীরের নিম্নাংশ বর্জ্জিত এবং হাত-গুলি গড়া হয় চোঙের আকারে। পুতুল গড়া ছাড়াও এরা সারা বছর মাটির টালি, হাঁড়িকুড়ি, সরা প্রভৃতি তৈরি করে। মাটির পুতুলের পরেই কাঠের পুতুলের স্থান। কাঠের পুতুল বাটালি দিয়ে কাঠের অংশ বিশেষকে চেঁচে তৈরি করা হয়। নানা রকম স্থানীয় কাঠ—হলুদ, গামার, শিমুল, আমড়া, ছাতিম ইত্যাদি দিয়ে বাংলার সূত্রধরেরা নানা কাঠের পুতুল, খেলনা তৈরি করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। পশ্চিম বাংলার নানা জায়গায় কাঠের পুতুল তৈরি হয়। বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলায় নানা রকমের পুতুল তৈরি হয়। সুরুতে মাটি, পিতল ও কাঠের পুতুল নির্মাণ টোটেম অনুযায়ী হোত। অদেখা শক্তি ও যাদু ক্রিয়াকর্মে এই পুতুলের আবশ্যক। জনমনের অভিব্যক্তি প্রকাশ হয় এদের মাধ্যমে। মালাকারেরা শোলার কাজে বিশেষ পারদর্শী। বিভিন্ন পাখি, কদমফুল এমন কি দুর্গা পর্য্যন্ত তৈরি হচ্ছে শোলা দিয়ে। কাটোয়া শিল্পীদের তৈরি চালচিত্র দেখার মত জিনিস। চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপা থেকে খনন কার্য্যের ফলে পাওয়া মৌর্য্যযুগীয় কাঠের খুঁটিতে কারুকার্য্য কিছু ছিল কিনা বলা না গেলেও খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরবর্ত্তী কালের একাধিক কাজের নিদর্শন ঢাকা ও কলিকাতার সংগ্রহশালায় আছে। কাঠ শিল্পের ধারা যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল তার নিদর্শন চণ্ডীমণ্ডপের বরগা, কপাট, খিলানের অংশ, রথের ভগ্নাংশ, চতুর্দোলা ও সিংহাসনের অংশ, কাঠের মূর্ত্তি ইত্যাদি। বর্দ্ধমান ও বীরভূমে প্রাপ্ত কাঠ শিল্পের সৌন্দর্য্য অপূর্ব। হুগলী জেলার কোতলপুর, রাধাপুর প্রভৃতি জায়গায় মন্দিরের কপাটের কাজ-গুলি রূপে, রেখায়, গড়নে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। খোদিত কপাটের বা খুঁটির বিষয়বস্তু হোল পৌরাণিক কাহিনী, কর্ণ-অর্জ্জুনের যুদ্ধ ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদে খাগড়া ও জিয়াগঞ্জ অঞ্চলে হাতির দাঁতের পুতুল তৈরি হয়। নানারকমের

দেবদেবী মূর্ত্তি, দাবা খেলার ঘুঁটি, জন্তু জানোয়ারের মূর্তি ইত্যাদি তৈরি হয় হাতির দাঁত দিয়ে। মেদিনীপুরের বৈষ্ণবচক জোতঘনশ্যাম অঞ্চলের শিল্পীরা মোষের শিঙ্ও গরুর শিঙ্ এর ফাঁকা ও নিরেট উভয় অংশ দিয়ে তৈরি করে জন্তু জানোয়ার, সারস পাখির প্রতিমূর্ত্তি, চিংড়ি মাছ প্রভৃতি। এগুলি ঘর সাজানোর পক্ষে খুব উপযুক্ত। এ ছাড়া চিরুনী তৈরি হয় গৃহসামগ্রী হিসাবে। কাপড়ের পুতুল তৈরি হয় কলিকাতায়। সরের বা ক্ষীরের পুতুলের রেওয়াজ না থাকলেও পূর্বে উৎসব উপলক্ষ্যে এ সব জিনিষ তৈরি হোত।

মুখোস বাংলাদেশের লোক শিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য। মুখোসের ব্যবহার হয় নাচে, সঙ সাজায়, বহুরূপীর কাজে। ছৌ নাচের মুখোস তৈরি হয় পুরুলিয়ায় আর কাঠের মুখোস তৈরি হয় দার্জিলিঙে। সাধারণ মাটি, কাগজ, কাপড়, রঙ আর ভার্নিস দিয়ে মুখোস তৈরি হয়। যে সব বিষয়বস্তু নিয়ে মুখোস তৈরি হয় তাদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের চরিত্রগুলিই মুখ্য। বিচ্ছিন্নভাবে বহু গ্রামে ও গৃহে বেত ও বাঁশের কাজ হয়। সাধারণ ঝুড়ি থেকে আরম্ভ করে নানারকম সৌখিন জিনিষ ও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরী হয়। মাদুরশিল্প অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। এ শিল্পের আরম্ভ হয়েছে মুসলমান আমলে। মাদুর তৈরি হয় মেদিনীপুরের সবং, দশগ্রাম, এগরা, রামনগর প্রভৃতি একাধিক কেন্দ্রে। তাছাড়া হাওড়া ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও মাদুর হয়। একহারা, দোহারা, সলাদ, কেলে, মেলে ও হোগলা—এই ছয় শ্রেণীর মাদুর এইসব কেন্দ্রে হয়। মাদুরের গায়ে নানারকম রঙের নক্সাও লক্ষ্য করা যায়।

রেশমী সুতোর টানায় অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যের মাদুর বাঙলার পরম আদরের। অপরূপ নকসায়, উচ্চাঙ্গের কারিগরী নৈপুণ্যে ও বয়ন চাতুর্য্যে বাংলার মাদুর সুবিখ্যাত। মাদুর, হোগলা পাটি বাংলার লোকজীবনের আবাল্য সঙ্গী। চাদর ও শতরঞ্চির পরিবর্ত্তে এদের ব্যবহার সর্ব্বত্র।

শঙ্খ বা শাঁখাশিল্প বাংলার একটি প্রাচীন কারুশিল্প। শঙ্খের কাজ হয় কলিকাতার বাগবাজারে, বারাকপুরে, হাওড়ার বাঁটুলে ও আরও অনেক স্থানে। শাঁখারী টোলার জন্ম হয় এইভাবেই। শঙ্খ শিল্পীর শাঁখ আসে মাদ্রাজ থেকে, আগে সিংহলের শাঁখে বেশী শাঁখা হোত। শাঁখার গায়ে নক্সায় গালা দিয়ে কত কাজ হয়। শাঁখার নক্সায় কাঁথালী কঙ্কন, বাঁশ গিঁট, মোতিদানা, মেট্রো, ভাবিয়া, জলতরঙ্গ, হোগলা পাতা, মানে না-মানা ও

রেল লাইন ইত্যাদি। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে উঠেছে। শঙ্খ শিল্পীরা নবশাখ শ্রেণীর লোক। এঁদের আরাধ্য দেবতা হলেন অগস্ত্যমুনি। শাড়ীর ছাপায় জংলা, স্বস্তিক রামাবলী, নামাবলী, নক্সী ফুল, লতা-পাতা, নানা জ্যামিতিক নক্সা, মাছ, পশুপাখি, মন্দির এইসব কিছুদিন আগেও দেখা গেছে। ধানের শিষ, প্রজাপতি, ময়ূর, সাপ দেখা যায় সোনার গহনায়। বালুচরী শাড়ী এখনও বোনা হয় বিষ্ণুপুর অঞ্চলে, তবে উৎকৃষ্ট ধরণের নয়। জামদানীর ব্যবহার নিতান্ত কম। অতীতের রেশম শিল্পের সাক্ষী হিসাবে ঘাটাল তথা দাসপুর এলাকার নানা স্থানে আজও বড় বড় রেশম কুঠির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঐ অঞ্চলের কোন কোন বাড়ীতে আজও রেশমের সুন্দর বস্ত্রাদি সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, ঘাটাল দাসপুরের সমৃদ্ধির পিছনে রেশম শিল্পের অবদান ছিল অসামান্য। ওয়াট্‌সন্ কোম্পানী, মেসার্স সুইস পেনি এণ্ড কোং প্রভৃতি ব্রিটিশ কোম্পানী এতদ্ অঞ্চলে রেশমের বড় ব্যবসাদার ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী-কালে বাজারে জাপানী সিল্কের আমদানী হওয়ায় দেশীয় রেশম শিল্প রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেশম শিল্পচর্চার মধ্যে বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল স্বাভাবিক ভাবেই। এ শিল্পের উৎকর্ষ ও উন্নতি কামনায় রেশম শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে কামিক্ষ্যাকে কল্পনা করা হয়েছে। রামায়ণ গ্রন্থে সীতার এই বস্ত্র পরিধানের কথা উল্লেখ আছে। রাজসূয় যজ্ঞকালীন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে চীন প্রভৃতি দেশের রাজগণ কৌষিক বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়েছিলেন। বাংলা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, নদীয়া এবং বর্দ্ধমানের কোন কোন অংশে রেশম উৎপন্ন হয়ে থাকে। মেদিনীপুর জেলা গেজিটিয়ারের তথ্য অনুসারে মাদ্রাজী পলু মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত ছিল। এই পলুর তন্তু সূক্ষ্ম ও কোমল। বাংলায় রেশম বস্ত্রের জন্য মুর্শিদাবাদের খ্যাতিই সর্ব্বাধিক, তার অর্থ এই নয় যে মুর্শিদাবাদের তুলনায় মেদিনীপুরের রেশমশিল্প নীরস।

নক্সী চামড়ার কাজ হয় কলিকাতায় ও বোলপুরের শান্তিনিকেতনে। বিচিত্র এমব্রয়ডারী ব্যাগ, নকশা-চামড়ার ব্যাগ, ওয়ালেট, সপিদ ও হ্যাণ্ডব্যাগ। শোলায় নকশার কাজ হয় নবদ্বীপে, কলিকাতার কুমারটুলি, বীরভূমের কিরণাহীরে, হাওড়ার বালি ও আমতা অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এবং নানা জায়গায়। শোলার টুপির কাঠামো হয় নদীয়ার কালীগঞ্জে। কাটোয়ার শিল্পীরা তৈরি

করেন অপূর্ব্ব ধরনের চালচিত্র। তা ছাড়া টোপর, মুকুট, খেলনা, ঝারা, চাঁদমালা এমন আরও কত কি! বিচিত্র রঙে আর জরি, রাঙতার কাজে ঝলমল করে উঠে।

কাঁথা শিল্পের প্রচলন অতি প্রাচীন। গৃহে গৃহে বধূরা কাঁথা তৈরি করে। বড় বড় পদ্ম, পশু পাখি, আসনের মত ছড়া, সূর্য্য, ধানের শিষ প্রভৃতি নক্‌সা কাঁথাশিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে। অলংকরণ ও রূপ বৈচিত্র্যে বাংলার কাঁথাশিল্প লোকশিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে সমাদর লাভ করেছে এবং একদা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। কাঁথাশিল্পের কাহিনী নূতন নয়; মহাভারতের শান্তিপর্বে কাঁথার (কন্থা) উল্লেখ দেখা যায়। কাঁথা ছিল বাংলার নারী-সমাজের এক কর্মযজ্ঞ। কিন্তু তাদের মানসিকতা হারিয়ে যাওয়ার ফলে কাঁথাশিল্পে চরম দুর্দিন দেখা দিয়েছে। কাঁথাশিল্পের বিবর্ত্তন আমাদের জানা নেই তবে প্রাপ্ত কাঁথার অধিকাংশই ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নয়। সংগৃহীত কাঁথার অধিকাংশই খুলনা, যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর অঞ্চলের তবে বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কাঁথা যে নেই একথা বলা চলে না। কাঁথার মূল উপকরণ হোল ছেঁড়া বা পুরানো পরিত্যক্ত কাপড়। একটির পর একটি করে প্রায় চার ছ'খানা কাপড় মাপ করে কেটে নানা রঙের সূতা দিয়ে বোনা হয় বিভিন্ন রকমের কাঁথা যেমন—লেপকাঁথা, সূচনী কাঁথা, আর্শীলতা (আর্শী-চিরুনী মুড়ে রাখার জন্য), ওয়াড় কাঁথা (তোরঙ্গ প্যাট্‌রা ঢেকে রাখার জন্য), বেটন কাঁথা (বইমুড়ে রাখার জন্য) ইত্যাদি। আকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করত এইসব নামের। কাঁথার প্রাথমিক কাজ শেষ হলে তার গায়ে ফুটিয়ে তোলা হোত বিভিন্ন নকশা—কুকুর, বেড়াল, গরু, ভেড়া, মাছ, হাতী, ফুলপাতা, পদ্ম, নৌকা ইত্যাদি। দৃশ্যাবলীর মধ্যে কৃষ্ণলীলার নানাদৃশ্য—বংশীহারী গোপীবল্লভ রাধা-মানভঞ্জক কৃষ্ণ, রামায়ণের দৃশ্যাবলী প্রভৃতি কাঁথার নকশায় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া কাঁথার গায়ে বিভিন্ন ছড়াও সূতার কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

মানবদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন সে আপন মহিমায় শত্রু-শক্তিকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু পঙ্গু বা দুর্ব্বল হয়ে পড়লে আর তাকে ঠেকানো যায় না—একেবারে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত করে ফেলে। ঠিক তেমনি সমাজ দেহে যতদিন জীবনী শক্তি থাকে ততদিন ঘরে বাইরের সব আঘাত প্রতিরোধ করতে থাকে, কিন্তু কালের প্রবাহে, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক কি সামাজিক কারণে

সমাজদেহ দুর্ব্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে—জঞ্জাল ও আবর্জনায় সমাজ স্তূপীকৃত হয়, আঘাত সহ্য করার মত আর শক্তি থাকে না। তাই আজ তাঁতিরা ঘরে ঘরে তাঁত বোনে না, কুমোরেরা সৌখিন মাটির কাজ করতে ভুলে গেছে, বেতের বা শোলার কাজ চোখে পড়েনা, সূচি বা কাঁথাশিল্পের চর্চ্চা যৎসামান্য আর অন্যান্য শিল্প তো যন্ত্র-দানবের দাপটে মৃতপ্রায়। বাঙালীর বারো মাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে একটিতেও প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা তা খুঁজে দেখার প্রয়োজন আছে। যান্ত্রিক সমাজে মানুষও যন্ত্র হয়ে গেছে—বাঁধাধরা জীবনের বাইরে অন্য কিছু চিন্তা বা চর্চ্চা করার অবকাশ কোথায়? লোকচিত্র শিল্প অন্যথায় চিত্রিত পুঁথি, অঙ্কিত পট, কাঠের তৈরি পুঁথির মলাট আজ বিলুপ্তপ্রায়। মাটির সরা বা পোড়ামাটির পাত্র চিত্রণও অবলুপ্তির পথে। কাঠ খোদাই-শিল্প, অলংকৃত কাঠের থাম, দেবদেবীর প্রতিকৃতি, পৌরাণিক উপকথা, জীবজন্তু, ফুল, পাখি ইত্যাদির কথা বর্ত্তমান মানব সমাজের চিন্তার বাইরে। এই শিল্প এখন পুতুল আর খেলনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলার অধিকাংশ শিল্পীরা যেমন পট, দারু, মৃৎ, ডোকরা ইত্যাদি আজ নিজেদের শিল্প কর্ম ত্যাগ করে ক্ষেত মজুরের কাজ করে জীবন ধারণ করে কারণ তাদের আর্থিক দুরবস্থা আজ এতই চরম যে শিল্পকর্ম করে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। শিল্প উপাদানের বাজার মূল্য আজ এতই বেশী যা তাদের আর্থিক ক্ষমতার উর্দ্ধে। সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট দৃষ্টি না দিলে অচিরেই যে বাংলার শিল্পকলা বিলুপ্ত হবে তা নিশ্চয় করে বলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন কীর্তির নিদর্শন এখনও যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে কি অবস্থায় আছে বোঝাবার জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি বিস্তৃত তালিকা পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল যাতে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি ঐগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অবহেলায় আর কিছুকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে না যায়।

১ জেলা	২ গ্রাম	৩ পুরাকীর্তি	৪ প্রকৃতি
মালদহ	গৌড়	কদমরসুল মসজিদ	— এই মসজিদে মহম্মদের পদচিহ্ন আঁকা একখানি পাথর আরব দেশ থেকে আনিয়ে মণিমাণিক্য খচিত কারুকার্য্য-মণ্ডিত একটি কাঠের বাক্সে রাখা আছে। এর নির্মাণ-কাল ১৫৩০ খৃঃ।
,,	,,	চামকাণ ,,	— বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত
,,	,,	বড়সোণা বা বারোদুয়ারী	—মসজিদের অধিকাংশ পাথরের তৈরী, কেবলমাত্র ছাদের গম্বুজগুলি ইটের। ছোটবড় ৪৪টি গম্বুজ ছিল এবং সম্ভবতঃ সোনার পাতে মোড়া ছিল। আলাউদ্দিন শাহ এর নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। মসজিদটি সমচতুষ্কোণ।
,,	,,	ফিরোজ মিনার	— মিনারটি বারকোণ বিশিষ্ট পাঁচটি থাকে অবস্থিত এবং ৮৪ ফুট উঁচু। উপরে উঠার জন্য ৭৩টি ঘোরানো সিঁড়ি আছে এবং এগুলি পাথরের। সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজশাহ কর্ত্তৃক এটি নির্মিত।
,,	,,	লোটন মসজিদ	— নটু নাম্নী এক নর্ত্তকীর নামানুসারে এই মসজিদটির নাম হয়। মসজিদের ইটগুলি সবুজ, নীল, পীত ও সাদা। মূল কক্ষের উপরে একটি গম্বুজ ও বারান্দায় ছোট ছোট তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদের আটটি বুরজীর সবগুলিই জোড়া। নির্মাণকাল ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ।

১	২	৩	৪
মালদহ	গৌড়	জামি মসজিদ	— মালদহের প্রাচীন কীর্তির অন্যতম। অপর নাম জুম্মা মসজিদ। আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। ৭২ ফুট লম্বা ও ২৭ ফুট চওড়া। কিছু অংশ ইট এবং কিছু অংশ পাথরের তৈরী।
পশ্চিম দিনাজপুর	গঙ্গারামপুর	বাণরাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ	— রোমান কলোসিয়াসের মত সুবিশাল কারুকার্য্যখচিত পাথরের স্তম্ভওয়ালা রাজপ্রাসাদ। রাজার শৌর্য্য ও পরাক্রমের স্বাক্ষর।
”	উষাহরণ	মহীপাল দীঘি	— পালযুগের নিদর্শন। দৈর্ঘ্য ৩৮শ ফুট ও প্রস্থ ১১শ ফুট। দীঘির পাড়ে হিন্দুদেবমন্দির ও মুসলমানদের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।
”	মহীপুর	প্রমোদভবন	— মহীপাল কর্ত্তৃক নির্মিত। বর্ত্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।
”	দেবগ্রাম	মন্দিরবাসিনীর মন্দির	— চারটি কারুকার্য্যময় স্তম্ভের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির বর্ত্তমানে অর্দ্ধভগ্ন ও মৃত্তিকায় অর্দ্ধপ্রোথিত। মন্দিরটি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী; দক্ষিণমুখী। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২১ ফুট এবং উচ্চতায় ২৩ ফুট। প্রবেশ পথ একটি এবং পাথরের তৈরী দরজার খিলানে অতীত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বিদ্যমান।

১	২	৩	৪
পশ্চিম দিনাজপুর	পতিরামপুর	বিদ্যেশ্বরী কালীমন্দির	— রাজ পরিবার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দেবী ভূগর্ভে নিহিত।
	বালুরঘাট	বুড়াকালীর মন্দির	— রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির।
”	কসবা মহশো	মসজিদ	— পুরাতন ইটের খিলান। চারটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে দু'টি এখনও অক্ষত। মসজিদটি পূর্ব্বদ্বারী। সর্ব্বত্রই পদ্ম খোদিত। নানারূপ লতাপাতারও কারুকার্য্য রয়েছে। অভ্যন্তরে চারটি স্তম্ভ, চারকোণে চারটি গম্বুজ ও মধ্যভাগে দু'টি গম্বুজ আছে।
জলপাইগুড়ি	ময়নাগুড়ি	জল্পেশ্বরের মন্দির	— মন্দিরটি ১২৭ ফুট উঁচু—গম্বুজাকৃতি। পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। রাজা জল্পেশের নামানুসারে মন্দিরটির নামকরণ (যোগিনীশাস্ত্র)। হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র।
”			
”	গড়মেন্দাবাড়ী	দুর্গ	— চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় ইটের প্রাচীর। চারদিকে চারটি প্রবেশদ্বার। এই দুর্গ নলরাজার দুর্গ ব'লে পরিচিত।
”	দেবীগড়	প্রাচীন মন্দির	— সাধারণ লোকের ধারণা মন্দিরটি দেবীচৌধুরাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
”	সোদর খই	পেটকাটি দেবীর মন্দির	— উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।
”	ময়নাগুড়ি	পূর্বন্দহর মন্দির	— কাটা পাথরের তৈরি মন্দিরটি বিশাল ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। আশে

১	২	৩	৪
			পাশে পড়ে থাকা কারুকার্য্যখচিত পাথর দেখে মনে হয় যে এক সময় মন্দিরটি দর্শনীয় ছিল।
কোচবিহার	কোচবিহার শহর	অনাথনাথ শিবমন্দির	— মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। উচ্চতা ২৮ ফুট। মন্দিরের ছাদের উপর গম্বুজ—তার উপরে পদ্ম, আমলক ত্রিশূল। বিড়াল-মূর্ত্তি'র উপস্থাপনা মন্দিরটিকে অভিনবত্ব দান করেছে। প্রতিষ্ঠাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক। ইটের তৈরি—চারকোণে চারটি স্তম্ভ মুসলীম স্থাপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
”	”	মদনমোহন মন্দির	— দালান মন্দির ; উপরে পদ্ম, আমলক, কলস, ও ত্রিশূল।
”	”	ডাঙ্গর আয়ী ”	— চারচালা ; উপরে পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।
”	”	ভবানীদেবীর ”	— ঐ
”	”	হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির	— ঐ
”	”	পুরাণী মসজিদ	— আঠারোটি মিনারযুক্ত ; চারকোণা থামের উপর বহুমুখী খিলান।
”	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বরী মন্দির	— আটকোণাকৃতি, গম্বুজশোভিত ; উপরে পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।
”	বাণেশ্বর	বাণেশ্বর শিবমন্দির	— চারকোণা ; পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল।
”	গোঁসানীমারী	কামতেশ্বরী মন্দির	— মুঘলস্থাপত্য ও বাংলা চালারীতির অপূর্ব্ব মিলন।

১	২	৩	৪
কোচবিহার	মধুপুরধাম	শঙ্কর মন্দির	— আটকোণাকৃতি ; অলংকরণযুক্ত ; শঙ্কর পন্থী বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান।
”	ধলিয়া বাড়ি	সিদ্ধনাথ শিবমন্দির	— পঞ্চরত্ন ; অলংকরণযুক্ত ; মুসলমানী স্থাপত্যের প্রভাব প্রতিফলিত।
”	নাককাটি গাছ	ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দির	— টিনের চালাযুক্ত।
”	বারকোদথলি	দামেশ্বর শিবমন্দির	— ঐ
”	হরিপুর	হরিহর মহাদেব মন্দির	— শিখরযুক্ত চারচালা ; মূল মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত।
দার্জিলিঙ	ঘুম	বৌদ্ধবিহার	— উল্লেখযোগ্য কিছু নেই ।
		মামলিন চোয়ালিং বৌদ্ধবিহার	— ” ” ”
”	দার্জ্জিলিং	শ্রীমন্দির	— মন্দিরের ভিতর সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দারুবেদীর উপর কালো পাথরের দু'ফুট উঁচু বিষ্ণুমূর্ত্তি। শোনা যায়, মূর্ত্তি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর ইতালী থেকে আনা হয়েছিল।
”	জজবাজার	তামাং বৌদ্ধবিহার	— বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনাকেন্দ্র।
”	ভুটিয়াবস্তী	বৌদ্ধবিহার	— সিকিমের মহারাজার বদান্যতায় বর্ত্তমান বৌদ্ধবিহারটি নির্মিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে পূর্ব্ব বিহারটি বিনষ্ট হয়েছিল।
”	আলুবাড়ি	বৌদ্ধবিহার	— উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

১	২	৩	৪
মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ শহর	আদিনাথ মন্দির	— জৈনদের মন্দির।
”	”	রত্নেশ্বর শিবমন্দির	— মন্দির গাত্রে পৌরাণিক ও রামায়ণ-মহাভারতের বিচিত্র দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ।
”	”	কিরীটেশ্বরী মন্দির	— বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।
”	মুর্শিদাবাদ	হাজারদুয়ারী	— হুমায়ুন শা কর্তৃক ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। নবাবী আমলে যে প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল তার নাম ইমামবাড়া। তারই অনুকরণে এটি নির্মিত। এর মধ্যে মূল্যবান চিত্র, সুদৃশ্য আসবাবপত্র এবং এখানকার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত আছে।
”	বড়নগর	ভবানীশ্বরের মন্দির	— আটকোণাকৃতি ; রাণী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
”	শাহনগর	জোড়া শিব মন্দির	— একজোড়া মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।
”	চন্দনবাটী	শিবমন্দির	— পালযুগীয় বলে অনুমিত।
নদীয়া	কাঞ্চনপল্লী	কৃষ্ণরায়ের মন্দির	— নহবৎখানা সমেত আটচালা মন্দির।
”	কুলিয়া	গৌর-নিতাই-এর মন্দির	— দালান মন্দির ; দেউলশিখর।
”	কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী	— রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত।
		রোমান ক্যাথলিক গির্জা	— খৃষ্টানদের প্রার্থনা কেন্দ্র।
		আনন্দময়ীর মন্দির	— চারচালা ; বর্ত্তমানে বিধ্বস্ত।
”	তেহট্ট	কৃষ্ণরায়ের মন্দির	— জোড়বাংলা ; অলংকরণযুক্ত।

১	২	৩	৪
মুর্শিদাবাদ	দিগ্‌নগর	রাঘবেশ্বর শিবমন্দির	— অলংকরণবহুল—দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা।
”	দোগাছি	শিবমন্দির	— টেরাকোটার সজ্জা ; ধ্বংসপ্রাপ্ত।
”	পালপাড়া	পালপাড়ার মন্দির	— রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম অলংকরণ ; জ্যামিতিক ও ফুলকারি নক্সা ; নদীয়ার শ্রেষ্ঠ মন্দির।
”	বামনপুকুর	বল্লালঢিবি	— বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ।
”	বীরনগর	রাধাকৃষ্ণের মন্দির	— জোড়বাংলা, অলংকরণযুক্ত—কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দেবদেবীই প্রধান।
”	মাটিয়ারী	রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির	— চারচালা মন্দির, পৌরাণিক ও সামাজিক অলংকরণ বহুল।
”	মায়াপুর	যোগপীঠ মন্দির	— সুউচ্চ, অঙ্গশিখর যুক্ত ; চৈতন্যলীলার অলংকরণ।
”	শান্তিপুর	শ্যামচাঁদের মন্দির	— টেরাকোটা সজ্জা যৎসামান্য।
”	”	জলেশ্বর মন্দির	— পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত—কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্যাবলী, বন্দুকধারী সাহেব ও সামাজিক দৃশ্যাবলী।
”	”	তোপখানা মসজিদ	— সম্রাট আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তৈরী।
”	শিবনিবাস	রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির	— স্থাপত্যে মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। খিলানগুলি গথিকরীতি, আটকোণা ভিত্তিবেদী ; অলংকরণ নেই।

১	২	৩	৪
হাওড়া	বেলুড়	বেলুড়মঠ	— স্থাপত্যশৈলীতে অভিনব—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার একত্র সমাবেশ। উচ্চতা ১০৮ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২০৫ ফুট। নির্মাণকাল ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ। নাটমন্দিরে বাংলা ও ওড়িয়া শৈলীর সমন্বয়।
”	অমরাগড়ি	দধিমাধবের মন্দির	— আটচালা; দক্ষিণমুখী; মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির অপূর্ব্ব সজ্জা—রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা থেকে আরম্ভ করে সমাজ জীবনের চিত্র। নির্মাণকাল ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ।
”	জগৎবল্লভপুর	শিবমন্দির	— আটচালা ; অলংকরণযুক্ত পূর্ব্বমুখী ইটের তৈরি মন্দির। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।
”	আসণ্ডা	শ্রীধরনাথ জীউর মন্দির	— ইটের তৈরি দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দির। পোড়ামাটির সজ্জা নিবদ্ধ। উচ্চতা ৩৫ ফুট। নির্মাণকাল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ।
”	গড়ভবানীপুর	মণিনাথ শিবমন্দির	— আটচালা ; পশ্চিমমুখী মন্দির—পোড়ামাটির সজ্জা আছে।
”	নিজবালিয়া	সিংহবাহিনীর মন্দির	— দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। অলংকরণ নেই।
”	রামপুর	বুড়োশিবের মন্দির	— আমলকযুক্ত পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির। নির্মাণকাল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। তেমন কোন অলংকরণ নেই।
”	সুলতানপুর	ঘটিয়াল শিবমন্দির	— নির্মাণকাল ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ। উচ্চতা ৩০ ফুট। অলংকরণের প্রাচুর্য্য চোখে পড়ে। চারচালা মন্দির এবং গঠন বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য।
”	রামেশ্বরপুর	শিবমন্দির	— পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির ; গম্বুজাকৃতি । নির্মাণকাল

১	২	৩	৪
			১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ। উচ্চতা ৩০ ফুট। উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার অলংকরণ বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।
”	মেল্লক	মদনগোপাল জীউর মন্দির	—দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। উড়িষ্যার প্রভাব লক্ষণীয়। টেরাকোটা অলংকরণের সমারোহ। হাওড়া জেলার সর্বপ্রাচীন দেবালয়।
হুগলী	বংশবাটী	হংসেশ্বরী মন্দির	— ইট ও পাথর দিয়ে মন্দিরটি তৈরি। উচ্চতা ৭০ ফুট এবং তেরোটি চূড়াবিশিষ্ট। বিগ্রহ পাথরের নয়, নিমকাঠের এবং নীলরঙের। বিচিত্র গঠন ভঙ্গিমায় এবং স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যে এই মন্দির বাংলার তথা ভারতের গৌরব।
”	সুখাড়িয়া	আনন্দভৈরবীর মন্দির	— ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। পঁচিশটি চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি ৭০ ফুটের বেশী উঁচু। মন্দিরের গায়ে টালির উপর নানা দেবদেবীর উৎকীর্ণ মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।
”	তারকেশ্বর	তারকনাথের শিবমন্দির	— স্থাপত্যশিল্পে উল্লেখযোগ্য না হলেও, দেবতার মাহাত্ম্যে প্রচুর যাত্রীর সমাগম হয়।
”	মহানাদ	ব্রহ্মময়ীর মন্দির	— নয়চূড়া বিশিষ্ট বিরাট এই মন্দির ১৮৩৪ সালে নির্মিত। এহেন কারুকার্য্য খচিত মন্দির এদেশে বিরল।
”	হুগলী	ইমামবাড়া	— হাজি মহম্মদ মহসীন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অট্টালিকা নির্মাণ করান। দর্শনীয় স্থান হিসাবে বিবেচিত।
”	ব্যাণ্ডেল	ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ	— খৃষ্টানদের আদি উপাসনা মন্দির। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে গির্জাটি

১	২	৩	৪
			পর্তুগীজরা তৈরি করেছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মুঘল আক্রমণে চার্চটি ভস্মীভূত হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীর পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। এটিও দর্শনীয় স্থান।
”	দিকসুই	নবরত্ন মন্দির	— নয়টি চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি কারুকার্য্য খচিত। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে তৈরি।
”	দ্বারহাটা	রাজেশ্বরের মন্দির	— আটচালা মন্দির—পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। রাম রাবণের যুদ্ধ এবং নৌকা বিলাস প্রভৃতি সূক্ষ্ম অলংকরণ প্রশংসার দাবী রাখে।
”	খানাকুল	রাধাবল্লভজীউর মন্দির	— আটচালা মন্দির। এরূপ সুবৃহৎ ও সুরম্য মন্দির হুগলীতে আর নেই। মন্দিরের সামনে অঙ্গসজ্জা হিসাবে বর্গাকার প্যানেলে ছয় সারিতে পোড়ামাটির শিল্পকার্য্য আছে।
”	ভগবতীপুর	মালাইচাঁদের মন্দির	— মন্দিরের মূর্তিগুলিতে যে সজীবতা, সাবলীল গতি, গড়ন এবং ডৌল প্রকাশিত তার তুলনা নেই।
”	কৃষ্ণপুর	আটচালা মন্দির	— ১৬৮৩ শতকে নির্মিত। রাম রাবণের দৃশ্যাবলী ছাড়াও ইউরোপীয় জাহাজ, সৈন্যদলের মার্চ্চ, শোভাযাত্রা, লম্ফনকারী অশ্ব প্রভৃতি চিত্রাবলী—তৎকালীন সমাজজীবনের একটা ছবি পাওয়া যায়।
”	বৈঁচিগ্রাম	৯৬টি মন্দির	— মন্দিরগুলি উড়িয়ার মন্দির স্থাপত্যের কথা স্মরণ

১	২	৩	৪
			করিয়ে দেয়। অধিকাংশ মন্দিরের অলংকরণ হচ্ছে বর্গাকার প্যানেলের মধ্যে ফ্লের চিত্র।
”	গুড়াপ	নন্দতুলালজীউর মন্দির	— মন্দিরটি আটচালা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। প্রবেশ-পথে খিলানের উপর বর্গাকার প্যানেলে ফ্লের চিত্র এবং থামের উপর দেবদেবী ও জীবজন্তুর অসংখ্য চিত্র অলংকৃত। শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে এগুলি প্রশংসার দাবী রাখে।
চব্বিশ পরগণা	সুন্দরবন	জটার দেউল	— মন্দির অতীব প্রাচীন। নির্মাণকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শীর্ষদেশ ভেঙে পড়লেও মধ্যাংশ পর্য্যন্ত অটুট আছে। গণ্ডীর গায়ে অলংকরণের সমারোহ আজও চোখে পড়ে।
”	জয়নগর	আটচালা মন্দির	— আয়তনে উল্লেখযোগ্য না হলেও অঙ্গসজ্জা ও মিথুন দৃশ্য পরিকল্পনায় অদ্বিতীয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল।
”	রাজপুর	অন্নপূর্ণার মন্দির	— সপ্তদশ শতকে নির্মিত এই মন্দিরটির গায়ে পদ্ম, পাখি ছাড়াও রামায়ণের বহু আলেখ্য সন্নিবিষ্ট। মন্দিরটি আট চালা বিশিষ্ট।
	মন্দির বাজার (পাটদহ) —	কেশবেশ্বরের মন্দির	— মন্দিরটি আটচালা এবং নির্মাণকাল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ। গঠনপ্রকৃতি বিচিত্র। দৈর্ঘ্যের তুলনায় দেওয়ালের

১	২	৩	৪
			উচ্চতা কম আবার দেওয়াল ও আসনের তুলনায় আচ্ছাদনও কম। এই ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও অঙ্গসজ্জা ও অভিনবত্বে প্রশংসার দাবী রাখে।
”	বাওয়ালী (আমতলা)	রাধাবল্লভ জীউর মন্দির	— মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং আটচালা বিশিষ্ট। একদা এটি সুসজ্জিত ছিল। ফুলের নক্সাকাটা ও চুণবালির ছটি সুন্দর ফুলের তোড়া দেখা যায়।
”	ধান্যকুড়িয়া	রাসমঞ্চ	— গঠনশৈলীর দিক থেকে মনোরম এবং অলংকরণ শোভিত। এহেন অপূর্ব রাসমঞ্চ চব্বিশ পরগণায় আর কোথাও দেখা যায় না।
”	হালিসহর	নন্দকিশোরের মন্দির	— মন্দিরটি আটচালা এবং গঠনপ্রকৃতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে।
”	খড়দহ	শ্যামসুন্দরের মন্দির	— অভিনবত্বে, বৈচিত্র্যে ও সমৃদ্ধিতে বৃটিশযুগের মন্দির শিল্পচর্চ্চার এক উজ্জ্বল সাক্ষর এই মন্দিরটি। কুড়ি ফুট এই মন্দিরটি আটচালা বিশিষ্ট এবং ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে চূনার পাথর দিয়ে এটি নির্ম্মিত হয়েছিল।
”	কাঁচড়াপাড়া	কৃষ্ণরাই মন্দির	— মন্দিরটি উচ্চতায় ৭০ ফুট, প্রস্থে ৪০ ফুট এবং চারিদিক সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির বড় বড় পদ্মফুল।

১	২	৩	৪
"	সাইবানা	নন্দদুলালের মন্দির	— মন্দিরটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট ; পূর্বমুখী এবং মেঝে শ্বেত-পাথরের।
"	দক্ষিণেশ্বর	ভবতারিণীর মন্দির	— রাণী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি নবরত্ন বিশিষ্ট।
মেদিনীপুর	মেদিনীপুর	জিষ্ণুহরি মন্দির	— তেমন কোন শিল্পবৈশিষ্ট্য নেই।
	তমলুক	বর্গভীমার মন্দির	— ৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ব।
"	খড়্গপুর	খড়্গেশ্বর শিবমন্দির	— উড়িষ্যার রেখদেউল স্থাপত্যরীতিতে গঠিত।
"	গড়বেতা	সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির	— মন্দিরটি সুউচ্চ এবং উত্তরমুখী। এটিও রেখদেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। মন্দির সংলগ্ন জগমোহন ইটের তৈরি।
"	কেদারকুণ্ড	চপলেশ্বর শিবমন্দির	— মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং মাকড়া পাথরের তৈরি।
"	কেশিয়াড়ি	সর্বমঙ্গলার মন্দির	— মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মাকড়া পাথরে উড়িষ্যা স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। সম্মুখে জগমোহন ও তৎসংলগ্ন বারোদুয়ারী নাটমন্দির। মন্দিরের গায়ে দুটি মিথুনদৃশ্য। সম্ভবতঃ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে এটি তৈরি।
"	হট্টনগর	হট্টেশ্বর শিবমন্দির	— পশ্চিমমুখী মন্দিরটি ইটের তৈরি। সম্মুখে জগমোহন ও নাটমন্দির। মন্দিরের চূড়ায় বেঁকি, আমলক ও পরপর তিনটি কলস ও পতাকাদণ্ড।

১	২	৩	৪
বাঁকুড়া	গোকুলনগর	গোকুলচাঁদের মন্দির	— ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত, পূর্বমুখী এবং পঞ্চরত্ন মন্দির। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল।
”	সোণাতোপাল	সূর্য্যমন্দির	— বর্ত্তমানে বিধ্বস্ত।
”	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর মন্দির	— জোড়-বাংলা; বহুল অলংকরণযুক্ত।
”	”	লালজীর মন্দির	— চারচালা কিন্তু একচূড়া।
”	”	মল্লেশ্বর শিবমন্দির	— বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; মন্দিরশীর্ষে আমলক ও কলস স্থাপিত।
”	”	রাসমঞ্চ	— অভিনব দেবসৌধ।
”	”	মদন মোহন মন্দির	— পোড়ামাটির অলংকরণবহুল।
”	”	রাধাশ্যাম মন্দির	— পঞ্চরত্ন।
”	ঘুটগেড়িয়া	প্রস্তর দেউল	— মন্দির স্থাপত্যে উড়িষ্যার প্রভাব; আদলে রেখ দেউল।
”	বহুলাড়া	সিদ্ধেশ্বর মন্দির	— সূক্ষ্ম অলংকরণের প্রাচুর্য্য এবং বেসর ও নাগররীতির অপূর্ব মিলন ঘটেছে এই মন্দিরে এবং এটি খাজুরাহের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়।
”	ডিহির	ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর	— উড়িষ্যা স্থাপত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে মন্দির দু'টি নির্মিত হয়েছিল।
”	”	এক্তেশ্বর শিবমন্দির	— পীঢ়া দেউল। পশ্চিমমুখী এই শিবমন্দিরটি প্রাচীর বেষ্টিত। উচ্চতা ৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ১৮ ফুট। এ রকম বিশাল স্তম্ভের মন্দির বাংলাদেশে আর নেই।

১	২	৩	৪
বাঁকুড়া	পাত্রসায়র	কালঞ্জয় শিবমন্দির	— রেখদেউল ; চারিদিকে ঢালু ছাদের প্রদক্ষিণ দালান পরে যুক্ত হওয়ায় এটিকে একরত্ন মন্দির বলে মনে হয়।
”	সাত্রাকোণ	রামকৃষ্ণজীউর মন্দির	— উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই।
”	হাড়মাসড়া	দেউল	— কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত।
”	সোণামুখী	শ্রীধর মন্দির	— পোড়ামাটির কারুকার্য্য।
”	ছাতনা	মৌলেশ্বর শিব মন্দির	— উড়িষ্যার প্রভাব প্রতিফলিত।
”	ডুবরাজপুর	বক্রেশ্বর শিব মন্দির	— চারচালা বিশিষ্ট।
বীরভূম	কেন্দুলী	রাধাবিনোদ মন্দির	— মন্দিরের গড়ন বাংলাদেশের নবরত্ন মন্দিরের মত এবং মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির প্রচুর অলংকরণ। সম্ভবতঃ ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এই স্থান গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেবের আবাসস্থল।
”	কলেশ্বর	কলেশনাথ শিবমন্দির	— মন্দিরটি নবরত্ন এবং আটচালা। সংস্কারের ফলে অলংকরণ প্রায় বিলুপ্ত।
”	ঘুরিষা	রঘুনাথজীর মন্দির	— পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত।
”	ডাবুক	ডাবুকেশ্বর শিবমন্দির	— প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী ১২৮৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত।
”	বক্রেশ্বর	বক্রনাথ শিবমন্দির	— বাংলা এবং উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতির মিলন হয়েছে এই মন্দিরে। মূল মন্দিরটি বৃহৎ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত।
”	ভাণ্ডীর বন	বিভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির	— স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য নেই।

১	২	৩	৪
বীরভূম	মহুলা	মউলেশ্বর শিবমন্দির	— প্রস্তর নির্মিত।
”	ইটাণ্ডা	জোড়বাংলা মন্দির	— পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত।
”	কবিলাসপুর	দেউল	— প্রস্তর নির্মিত। এক নূতন স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। মন্দিরের ভিত্তিবেদীর উপর থেকে শিখরগুলি কৌণিকরেখা অবলম্বনপূর্বক উদ্গত এবং বাড় ও গণ্ডীর মধ্যে কোন লক্ষণীয় প্রভেদ নেই।
”	নলহাটী	ললাটেশ্বরী	— মন্দিরাস্থিত দেবী কালিকা ও ভৈরব যোগেশ বিরাজমান।
”	আঙ্গোরা	শিবমন্দির	— ইটের তৈরি ; অলংকরণ মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করেছে। এটি দেউলরীতির এক উজ্বল দৃষ্টান্ত। শিখর সপ্তরথ, খাঁজকাটা এবং ছাদ ধাপপদ্ধতিতে নির্মিত।
”	সোণাতোড়	রাধাদামোদর মন্দির	— মাকড়াপাথরের তৈরি আটচালা মন্দির। মন্দিরে প্রচুর অলংকরণ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত।
পুরুলিয়া	কাঁসাই	জৈনমন্দির	— বর্তমানে বিধ্বস্ত। মিশরীয় ভাস্কর্য্যের চিহ্ন বর্তমান। মূর্তিটি তীর্থঙ্করের বলেই মনে হয়।
		বড়ম	— ঐ
”	পারা	মন্দির	— নরম পাথরে তৈরি। ভাস্কর্য্যে অতুলনীয়।
বর্দ্ধমান	বরাকর	কলাণেশ্বরীর মন্দির	— মন্দিরের খাঁজ কনকেভ। সম্ভবতঃ মন্দিরটির নির্ম্মাণকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ। দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মন্দিরটি তুলনীয়।

১	১		৩	৪
বর্দ্ধমান	ক্ষীরগ্রাম	—	যোগাদ্যা	— মন্দিরের দ্বার সংলগ্ন বেলে পাথরের কাজগুলি খৃষ্টীয় সাত আট শতকের বলে অনেকে মনে করেন।
”	পাতুন	—	পাতুনেশ্বর/পটেশ্বর শিবমন্দির	— উল্লেখযোগ্য হোল মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে পাথরের মূর্ত্তি— বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেবী; অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য; ধর্মরাজের নানা আকারের কূর্মমূর্ত্তি; শিবলিঙ্গ।
”	জোগ্রাম	—	জোগ্রামের মন্দির	— বর্ধমানের বিশিষ্ট পুরাকীর্ত্তি; গম্বুজাকৃতি। শীর্ষে আমলক কলস, বেঁকি ও পতাকা।
”	কুলীনগ্রাম	—	গোপালজীর মন্দির	— মন্দিরের উপরিভাগ খাঁজকাঁটা—ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে। সম্মুখে জগমোহন ও নাটমন্দির। উড়িষ্যারীতির ছাপ পড়েছে বলে মনে হয়।
কলিকাতা	ভবানীপুর	—	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল	— গম্বুজাকৃতি—তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত। গম্বুজের নীচে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি। শ্বেত পাথর-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।
”	ধর্মতলা	—	শহীদ মিনার (অক্টোরলনী মনুমেন্ট)	— নেপাল যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতির স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই অক্টোরলনী মনুমেন্ট।
”	টালিগঞ্জ		নবরত্ন মন্দির	— নয়টি রত্নবিশিষ্ট; অনেকটা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের মত।
”	কালিঘাট		কালী মন্দির	— ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের তীর্থস্থান।

এছাড়া বিভিন্নস্থানে রয়েছে অসংখ্য গির্জ্জা।

উৎসব ও অনুষ্ঠান-প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব পার্বণ বা ধ্যানধারণা আর্য্য বৈদিক আচারভুক্ত নয়। উত্তর ও মধ্যভারত থেকে ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতে আর্য্য সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে অনেক পরে এবং পূর্বভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এককালে একভাবে হয়নি। এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাস অনেক আছে (Spread of Aryanism in Bengal - D. C. Sirkar)। এ থেকে এটুকু আভাষ পাওয়া যায় যে মিথিলা অঞ্চলে প্রথম আর্য্য বসতি গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে আর্য্যসংস্কৃতির ধারা উত্তর বঙ্গে এবং মগধে, পরে আধুনিক আসামে (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) এর ক্রমবিস্তার ঘটে। পাটলিপুত্র থেকে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশের রাজারা যে বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ অনুমান সত্য বলে মনে হয়। অতঃপর দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার প্রদেশ অনেকটা আর্য্যীকৃত হলেও বাংলাদেশ ও উড়িষ্যায় কেবল আর্য্য সংস্পর্শ ঘটেছে; প্রকৃত আর্য্যীকরণ দীর্ঘকাল সম্ভব হয় নি। তার মধ্যে আবার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে প্রথমে আর্য্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে; অন্যান্য অংশে অনেক পরে আর্য্য-সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত আর্যসংস্কৃতির প্রসার বাংলাদেশে এই ধারায় হয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন—প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পরে পশ্চিমবঙ্গে। প্রায় ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আর্য্যসংস্কৃতি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্য্য সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গে অনার্য্য সংস্কৃতির একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানা স্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি কিন্তু কৃষিকর্মের উন্নত মর্য্যাদা আর্য্য সংস্কৃতির দান। আর্য্যসংস্কৃতির প্রসার পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হওয়ার পরেও সর্বত্র ব্যাপকভাবে হয় নি। বড় বড় বনময় অঞ্চলগুলি যেমন বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, উত্তর মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা কতকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ছিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠী-পতিরা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং উপরের সিংহাসন বদল হলে তারা নামেমাত্র আনুগত্য স্বীকার করতেন। হিন্দুযুগ ছাড়িয়ে মুসলমান যুগে এমন কি বৃটিশ যুগের প্রথম পর্ব পর্য্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই পশ্চিমবঙ্গে

অনার্য্য সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এবং কয়েকটি অঞ্চলে তার প্রাধান্য অনুভব করা যায়। চণ্ডীভৈরব কুদ্রাবড়ম প্রভৃতি নানা রকমের বন-দেবতার উৎসবের প্রচলন তাই আজও এইসব অঞ্চলে বেশী। ঠিক পরবর্ত্তীকালে স্তম্ভশীর্ষে জীবজন্তুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হোত। তারই প্রকাশ হিসাবে বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজ, মকরধ্বজ, শিবের বৃষধ্বজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পূজা ও স্তূপ প্রতীক পূজা রাঢ়ের একাধিক জায়গায় স্থান পেয়েছে এবং এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রাম্যদেবতা রূপে রূপায়িত হয়েছেন, যদিও বৌদ্ধধর্মকে অপসারণের জন্য শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলিকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করেছেন এবং জনমানসে বিশ্বাস আনার জন্য দেওয়ালের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর উপস্থাপনা করা হয়েছিল। শিব ক্রমে প্রধান গ্রাম্যদেবতা হওয়ার ফলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। গ্রাম দেবতার সঙ্গে গ্রামদেবী থাকতেন অর্থাৎ পুরুষ দেবতার সঙ্গে একজন স্ত্রী দেবতা। রাঢ়ের গ্রাম-দেবতা ধর্মের সঙ্গে থাকতেন তার কামিন্যা। কামিন্যাদের নানারকম নাম আছে। এই কামিন্যারাই ক্রমে শক্তি ও তান্ত্রিকধর্মের প্রভাবে গ্রাম্যদেবতা কালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি হয়েছে বলে মনে হয়। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্মঠাকুর ও শিবপূজাকে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলে লোকউৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে মনসা পূজার প্রচলন বর্দ্ধমান অঞ্চলে সর্বাধিক। তাছাড়া বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে মনসাপূজা ও ঝাঁপান উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে তিনি পূজিতা। কোথাও বিষহরি, কোথাও কঙ্কনাগ, কোথাও নন্ননাগ আবার কোথাও বা ঝাঁকলাই, জগৎগৌরী ও মনসা। বাংলাদেশে প্রাগ্‌আর্য্য ও আর্য্যোত্তর যুগ থেকেই মনসা পূজার প্রচলন ব্যাপক ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই নদীবহুল বাংলাদেশে সর্পের প্রাদুর্ভাবে ও সর্পদংশনের আতঙ্ক ও সর্পবিষ প্রতিরোধ চিন্তায় মনসা পূজার প্রবর্ত্তন হয়। বৌদ্ধযুগেও মনসা জাগুলী বা জাঙ্গুলী নামে পূজিতা হতেন। আর্য্যোত্তর যুগে মনসা দেবীর বিস্ময়কর প্রভাব মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রতিফলিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে মনসা অযোনিসম্ভূতা কশ্যপমুনির মানস কন্যা।

আভ্যন্তরীণ সংঘাতে—আর্য্য-অনার্য্য-শাক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সংঘাতে—ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-ইউরোপীয় ইত্যাদির সমন্বয়ে

বাংলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় পাঁচালী আর তর্জ্জায়, যাত্রাভিনয়ে আর ধর্মঠাকুরের গাজনে, কবিগান আর খেউড়ে। খাঁটি বাঙালী গানের ধারা চলতে থাকে কীর্ত্তন ও বাউলে, জারি, সারি, ভাটিয়ালী—বেদগানে আর শ্যামা সঙ্গীতে। লোকসাহিত্যের অপরূপ নিদর্শন মেলে গীতিধর্মী পল্লীকাব্যে।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব পল্লীগীতি, গাথা, পাঁচালীগান প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের এক অমূল্য-সম্পদ। বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান মুখ্যতঃ রাজবংশীদেরই অবদান। পাঁচালীগানও উত্তর বঙ্গের সর্বত্র সমাদৃত। পাঁচালীগান সাধারণতঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ের একমাত্র দেবী বিষহরি বা মনসাদেবীর পূজার আঙ্গিক অনুষ্ঠান। আবার এই পাঁচালীগানই রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনকাব্য। এই গানের সূত্র ধরেই নিজেদের সামাজিক চিত্রটি ফুটিয়ে তোলে। সমাজের গ্লানি প্রকাশ্যভাবে আলোচনার যোগ্য নয় তা সাধারণতঃ গানের মাধ্যমে প্রচার ক'রে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মূল বিষহরি পাঁচালীগান থেকে আর এক ধরনের পাঁচালী রচনাও আসর করে গান করা হয়ে আসছে। একে বলা হয় রঙ পাঁচালী। রঙ পাঁচালী সাধারণতঃ সামাজিক চিত্রের সঙ্গীতরূপ। যুদ্ধপূর্ব্বসময় থেকে এই রঙ পাঁচালীরও রূপান্তর ঘটে। প্রায় ওই সময় থেকে সহজ যাত্রাগানের অনুরূপ পালারচনা ও অভিনয়ের আসর বসানো হয়। রাজবংশীদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে প্রধান হলেন বিষহরি বা মনসাদেবী। বস্তুতঃ মনসাদেবী শুধুমাত্র সর্পাতঙ্কই দূর করেন না, ইনি সব রকম ব্যথা, যন্ত্রণা ও শারীরিক পীড়া নিরাময় করেন। গ্রামের সার্বিক মঙ্গলের দায়িত্ব দেওয়া থাকে গ্রামঠাকুরের উপর।

বিভিন্ন ভাষাভাষীর অধিবাসিদের নিয়ে দার্জিলিং জেলা। কাজেই এই জেলার সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ ও রেখা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অবশ্য সমস্ত উত্তরবঙ্গের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেটা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে স্বতন্ত্র। উত্তর বাংলার এই সংস্কৃতি জানতে হলে সমগ্র অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস ও বর্ত্তমানকালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্থান পতনের বিশদ বিবরণ অনুধাবন করা প্রয়োজন। উত্তর বাংলার গ্রামীণ ও শ্রমনির্ভর জীবনধারণই এই-সংস্কৃতির মূল উৎস। নেপালী সম্প্রদায় অধ্যুষিত পার্ব্বত্য শহর ও গ্রামাঞ্চল-গুলির দৈনন্দিন জীবনযাপনের আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বাদ অপূর্ব্ব হলেও সমতলের জীবনধারার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই

এবং তার সংস্কৃতির যে ধারাটি বয়ে এসেছে তার রূপান্তর একেবারে ঘটেনি বললেই চলে। তার কারণ হিসাবে তাদের অবকাশ কম বলা যায়। মূল সংস্কৃতির ধারাটি এসেছে পশ্চিম নেপালের পার্বত্য অংশ থেকে। পল্লী গীতি ও পল্লীনাচের মধ্যে হিন্দুধর্মের কাহিনীগত বিকাশ এবং পর্বতের বন্দনা ও গুণগান ছাড়া বিশেষ কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না।

নেপালী সম্প্রদায়ের প্রধান লোক উৎসব হোল—তিওহার। কালীপূজার পাঁচদিন আগে থেকে এই উৎসব শুরু হয়। প্রথম দিন কুকুর তেওহার অর্থাৎ রাস্তাঘাটের কুকুর ধরে ফুলের মালা পরিয়ে ভাল ভাল খেতে দেওয়া। দ্বিতীয় দিনে কাক তেওহার অর্থাৎ কাকের আপ্যায়ণ। অনুরূপভাবে তৃতীয় দিনে গাই বা গরুর তেওহার এবং উপকারী জীবজন্তুকে নিয়ে আরও ছ'দিন তেওহার হয় এবং কালীপূজার দিন এর সমাপ্তি ঘটে। দেওশি বা দেবশ্রী নেপালী সম্প্রদায়ের আর এক জনপ্রিয় উৎসব। একজন গান করে আর সমস্ত লোক গানের প্রতি চরণের শেষে দেওশিরে বলে গানে তাল দেয়। এই উৎসবে সাধারণতঃ বলিরাজার উপাখ্যান গীত হয়ে থাকে। শিবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপন নেপালীদের একটি নিষ্ঠাযুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বৌদ্ধ খ্রীষ্টান নেপালীরাও অত্যন্ত ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করে। চৈত্রের গাজন নেপালীদের কাছে ধর্মানুষ্ঠান বহির্ভূত ব্যাপার; কিংবা দেবীপূজা সম্পর্কেও নেপালীরা আগ্রহী নন। বাঙালী হিন্দুরা পূজার্চ্চনার সঙ্গে সঙ্গে শিবকে যেমন নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গী করে তুলেছে, নেপালীরা তা করেন নি বলেই শিবের নামে নেপালী লোকগাথা নেই। তরাই-এর চা শ্রমিকেরা জাতিতে মুণ্ডা, ওরাও, কোরায়া। এদের উপাস্য দেবতা সূরজ নারায়ণ বা সূর্য্য। এছাড়া তাদের কোন ধর্ম-বোধ নেই বা ধর্মের অনুষ্ঠান নেই। সিংবোঙা বা বীরহোড় নামে যে দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় তা বস্তুতঃ মাঠের বা বনের দেবতা। তরাই-এর আদিবাসী নাচ ও গান আর এক আকর্ষণীয় বস্তু। সাধারণতঃ সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে সাঁওতাল পল্লীতে এগুলি অনুষ্ঠিত হয়। বছরের বিশেষ কোন পরবের দিনে গ্রামের এক প্রান্তে কিংবা বনের ধারে গিয়ে সাঁওতাল মেয়ে ও পুরুষ জমা হয় এবং হাঁড়িয়া খেয়ে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে ফাগুয়া এবং বীরহড় পরবই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাঠে ফসল কাটার সময়ও সাঁওতাল নরনারীরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেটা প্রায় নবান্ন উৎসবের মত। নাচ ও গান প্রতিটি অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ। চৈত্রমাসে চা শ্রমিকদের মধ্যে যে উৎসব

হয় তার নাম চৈত্র দাণ্ডার। মাদার গাছের ডাল ভেঙে প্রত্যেক নরনারী একটা করে দণ্ড গ্রহণ করে এবং সেই দণ্ড হাতে নিয়ে তিনদিন ধরে তারা প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ফেরে। রাত্রিতে নারী পুরুষ সকলে একত্রে নাচগান করে। এই সময় যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অবাধ মিলনের সামাজিক ছাড়পত্র দেওয়া হয়। দশেরা উৎসবও চা শ্রমিকদের আরও এক প্রিয় উৎসব। নাচগান পালাক্রমে তিনদিন চলে ; অনেকটা অষ্টপ্রহরব্যাপী নাম সংকীর্ত্তনের মত।

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া। গৌড়ে নবাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাবে ইসলাম সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও মালদহ হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মচর্চ্চার এক উল্লেখযোগ্য পীঠভূমি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন ছাড়াও হলায়ুদ মিশ্র, রূপসনাতন, চক্রপাণি দত্ত, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনন্দন, বীতশোক, রামাইপণ্ডিত প্রভৃতি জ্ঞানীগুণীর সমাবেশে এই জেলায় প্রাচীন শিল্প, ললিতকলা, ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠে। মালদহের উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ প্রভৃতির মধ্যে নাচ ও গানের প্রাধান্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু কম নয়। এই জেলার লোক সংস্কৃতির মধ্যে ঘুমপাড়ানী গান, পৌষ-পার্বণের ছড়া, বিবাহের গান, বৃষ্টি নামানোর গান, নতুন ফসলের গানগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে এগুলি সাধারণতঃ গায়কী গানের মধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রকাশভঙ্গি। লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রত উদ্যাপন, মঙ্গলচণ্ডী, সন্ধ্যাপূজার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ভাজো' হলেন ফসলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভাদ্রমাসে দশদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ব্রতের উদ্যাপন। দশম দিনে ভুট্টাগাছের সঙ্গে কলাই-এর বিবাহ অনুষ্ঠান। এ ছাড়াও মেয়েদের মধ্যে আরও বহু প্রকারের ব্রতানুষ্ঠান আছে। আর এই ব্রতানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সাধারণতঃ দৈনন্দিন ও সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী। এমনি করেই বয়াই, নাইকোরী, পাইকোরী প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে 'আলকাপ' নামে এক ধরণের সঙ্গীতানুষ্ঠান পাওয়া যায় যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মমত আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির নির্বিচার বর্ণনা থাকে। মালদহের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই আলকাপ গান সর্বসাধারণের খুব প্রিয়। ছোটখাটো সমসাময়িক ঘটনা, নানাপ্রকার রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুক এবং উপদেশাবলী দিয়ে আলকাপ গান মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রচিত হয়ে থাকে। যদিও মুসলমানরাই এর রচয়িতা—তবুও আসর বন্দনা ও গানের ভিতরকার প্রয়োজনীয় অংশে হিন্দু দেবদেবীর সাক্ষাৎ প্রায়শঃ ঘটে। এর পরেই উল্লেখ করতে হয়

মালদহের তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি গম্ভীরা। যদিও গম্ভীরা গানকে বর্ত্তমানকালে বৈঠকী ও ফ্যাশনদুরস্ত গানের রূপ দেওয়া হয়েছে—তথাপি গম্ভীরা লৌকিক অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গমাত্র। চৈত্র উৎসব ও গাজনের সময়ে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে পূজার আচারবিধি অনুযায়ী। কবে থেকে গম্ভীরা গান চৈত্র উৎসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়েছে তার ইতিহাসযোগ্য প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত মেলে নি। তবে একথা বলা যায় যে মালদহ ছাড়া রাঢ় ও পূর্ববঙ্গে গাজনের উৎসবে যে নাচ-গানের প্রচলন আছে তার সঙ্গে গম্ভীরার কোন সাদৃশ্য নেই। রাঢ় ও পূর্ববঙ্গে গান ও নাচের কালানুক্রমিকতা নেই কিন্তু গম্ভীরার মধ্যে রয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় গম্ভীরা সম্পর্কে বলেছেন—"ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা কৌশল, বাক্য বিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরার গীতকর্ত্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়।" এ থেকেই অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগের বাংলাদেশে যখন একদা বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে এবং মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম ধারক পদাবলীর মাধ্যমে বাঙালীর ভাবময় মানবিকতা ভগবৎ লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তখনও গম্ভীরার প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। অন্ততঃ বঙ্গসংস্কৃতির অনুশীলনরত চিন্তাশীল মনীষিগণ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য মালদহের গম্ভীরা আঞ্চলিকতার আবিলতায় আচ্ছন্ন—বাক্যবিন্যাস ও রচনা কৌশলে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে—কিন্তু গম্ভীরার প্রাণবস্তু আজ পর্য্যন্ত বাংলায় লোকগীতিগুলির সমস্ত ধারার মধ্যেই প্রাচীন ও চিত্তবিমোহন। গম্ভীর শব্দের অর্থ দুই প্রকার। অনেকের মতে শিব আবার অনেকের মতে নির্জ্জন দেবগৃহ বা মন্দির। গোবিন্দদাসের রচনার মধ্যে অন্ততঃ এই দুই প্রকার অর্থেরই সন্ধান পাওয়া গেছে। 'দুইহাতে বন্ধি বাণী থুইল গম্ভীরে' কিংবা 'গম্ভীরে বসিয়া যোগী ধ্যানেতে জানিল' প্রভৃতি শব্দ গঠনভঙ্গির মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক ভাবেরই প্রাবল্য। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে গম্ভীরা উৎসবের শুরু। প্রথম দিন অধিবাস অর্থাৎ ঘটস্থাপনা ও পূজারম্ভ। দ্বিতীয় দিনে ছোটরঙ গান অর্থাৎ ভক্তগণ কর্তৃক বেতের ছড়ি বা ত্রিশূল হাতে বন্দনাদি গান ও নাচ। তৃতীয় দিনে বড় রঙ অর্থাৎ নানাপ্রকার শারীরিক কৌশল দ্বারা বানকোঁড়া, শ্মশান জাগানো ইত্যাদি অনুষ্ঠান। চতুর্থ দিনে বালা বা বোলাই-গানের আসর অর্থাৎ শিব-পার্বতীর বিবাহ বা পার্বতীর শাঁখা পরিধান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পালাগান। এই আসর একাদিক্রমে কয়েকদিন ধরে চলতে পারে

এবং এর মধ্যে ব্যক্তিগত কুৎসাকাহিনী কিংবা গোপন প্রেমের কাহিনীর সাড়ম্বর বর্ণনাও থাকতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রচারে গম্ভীরা ছিল অন্যতম মাধ্যম।

লোকসংস্কৃতিতে মালদহের সঙ্গে পশ্চিমদিনাজপুরের খুব একটা পার্থক্য নেই। সেখানের মত গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতির চর্চ্চা এই জেলায় কোন কোনও ক্ষেত্রে নজরে পড়ে। এই জেলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে রাজবংশীদের অবদান যেমন পৃথক করা যায় না তেমনি আবার এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ধারাকে জেলার মান হিসাবে নির্ণয় করা চলে না। বসতি বিন্যাসের বৈচিত্র্যহেতু এই জেলার সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলার প্রভাব এসে পড়েছে। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান, ছড়া, ব্রত উদ্‌যাপন হেঁয়ালী, ধাঁধাঁ প্রভৃতিতে প্রভাব রয়েছে অবিভক্ত বাংলার রংপুরের।

কোচবিহারের আঞ্চলিক ও লৌকিক দেবতার অর্চ্চনাবিধির মধ্যে সঙ্গীত রচনা, নৃত্য প্রভৃতির আধিক্য লক্ষণীয়। বস্তুতঃ, উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই এরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লৌকিক দেবতার আবির্ভাব ঘটে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের নানারূপ সমস্যাসঙ্কুল বিষয় এবং তার প্রতিকার হিসাবে দেবানুগ্রহের জন্য ব্রত উদ্‌যাপন, সংগীতাদির প্রচলন আছে সর্ব্বত্রই—যেমন পথের পূজা। কোচবিহারের রাজবংশীদের মধ্যে এই পূজাকে বলে অথাই পথাই পূজা। ব্রত উদ্‌যাপন বিধির মধ্যে কিছুটা দক্ষিণ বঙ্গীয় ব্রতবিধির প্রচলন আছে এবং ব্রতের শেষে কথা শোনার রীতিও প্রচলিত এবং প্রত্যেক ব্রতের কথা বা উপাখ্যান আছে। বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হোল এই যে ব্রত উদ্‌যাপন শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রয়োজনবোধে পুরুষদের মধ্যে ব্রত উদ্‌যাপনের প্রথা উত্তরবঙ্গে আছে। যেমন রাতকানা, ফোঁড়া বা ঘা, পাঁচড়া কিংবা বাতের ব্যথা নিরাময়ের জন্য 'অন্ধশূলা'র ব্রতকথা প্রচলিত আছে।

কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ 'ভাওয়াইয়া' ও 'চট্‌কা' গান। ভাওয়াইয়া গান সাধারণতঃ করুণরসের জীবন ব্যঞ্জনামণ্ডিত লোকগীতি। কোচবিহারের পল্লী প্রান্তরে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই এই গান শোনা যায়। প্রেমই মুখ্য বিষয়বস্তু এবং প্রেম অবলম্বন করেই সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার বিভিন্ন ধারা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে এই ভাওয়াইয়া গানে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ভাওয়াইয়া গান শুধুমাত্র কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের কথ্যভাষাতেই রচিত হয় না. সময়ে সময়ে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাতেও ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়ে থাকে।

চট্‌কা গান সাধারণতঃ চটুলরস এবং সরস কাহিনীর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। রঙপুর অঞ্চলে চট্‌কা গানের মধ্যে অশ্লীলতার সন্ধান পাওয়া যেত। তবে এখন পর্য্যন্ত সাধারণের মধ্যে বা সর্ব্ব সময়ে চট্‌কা গানের আসর বসে না। বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ্যে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেহতত্ত্বমূলক গানের প্রচলন আছে এবং সাধারণতঃ এগুলি ভক্তিবিষয়ক। গ্রামাঞ্চলে বাউল ও ফকিরদের মধ্যে যথেষ্ট দেহতত্ত্ব গান শোনা যায়। এ ছাড়া, কোচবিহারের মেচ, গারো প্রভৃতি অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে মুখোস নৃত্যের কথা শোনা যায় এবং কোন বিশেষ পূজা ও উৎসব ছাড়া তারা মুখোস নৃত্য করে না।

বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রধান উৎসব হোল টুসু ও ভাদু। গানই হোল এই উৎসবের প্রধান এবং একমাত্র অঙ্গ। ভাদুর সময়কাল ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত এবং প্রতি রাত্রে গানের আসর বসে। সংক্রান্তির দিনই হোল মূল উৎসবের দিন। এই রাতটিকে ভাদু জাগরণ বলে। মেরাপ বাঁধা হলে সেই সুসজ্জিত মেরাপের মধ্যে কাঠের তৈরি এক নারী মূর্ত্তি বসিয়ে পাড়ার বা পরিবারের মহিলারা সমবেত হয়ে গানের আসর বসান। কোথাও আবার মূর্ত্তি ছাড়াই ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রঙীন কাগজের নানারকমের ফুলপাতা তৈরি করে মেরাপ সাজানো হয়। এই প্রাচীন লোক উৎসব কবে কোথায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। ভাদু গানগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এবং সেইভাবেই গাওয়া হয়ে থাকে। কেউ কেউ ভাদু উৎসবকে করম উৎসব বা জাউয়া গানের সংস্করণ বলে মনে করেন। ভাবগত একটা ঐক্য থাকলেও এদের সঙ্গে ভাদু উৎসবের আনুষ্ঠানিক কোন মিল নেই। ভাদু উৎসব ফসল ফলানোর উৎসব। ফসলের সঙ্গে এই উৎসবের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। অন্যান্য লোকসংগীতের মত ভাদু গানেরও একটা নিজস্ব রচনা পদ্ধতি ও সুর আছে। চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে কুমারী মনের ভাবনা চিন্তা, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি আছে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়বস্তু। সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির মধ্যে বর্ষাকালে অথবা হেমন্তকালে করম পরব হয়ে থাকে। অনেক পণ্ডিতের মতে এটি বর্ষা উৎসব এবং বাংলাদেশের ভাদু উৎসব তারই হিন্দু সংস্করণ। টুসুর উৎসবকাল পৌষমাস—পৌষের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত চলে টুসু উৎসব। এতেও সর্ব শ্রেণীর মহিলারা অংশগ্রহণ করে। এর

প্রাচীনতাকেও সন তারিখ দিয়ে নিরূপণ করার উপায় নেই ; তবে এ উৎসবের সঙ্গে নবান্ন উৎসবের একটা নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। নতুন ধান যেমন নবান্নের প্রধান অঙ্গ তেমনি সেই ধানের তুঁষই হোল টুসুর অঙ্গ।

লবান্নর ধান ভাইন্‌লাম দিনক্ষ্যাণ কৈর‍্যে
তারই কুড়া রাইখ্‌লম টুসালুর তরে ॥

ভাদুর মত প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা প্রত্যেকেই একটি পাত্রে কিছু খাদ্য সামগ্রী যেমন—খই, মুড়ি, চিঁড়ে, তিলের লাড়ু ইত্যাদি নিয়ে টুসু উৎসবে যোগ দেয়। টুসু অর্থাৎ তুষে পরিপূর্ণ নানারঙে রঞ্জিত পুষ্পশোভিত পাত্রটিকে সামনে রেখে তারা গান গায়। টুসু নাম নিয়ে নানাজনের নানা মত আছে। কেউ বলেন তোষলা ব্রতই হোল টুসু, কেউ বলেন তুষার শব্দ থেকে টুসু নামের উৎপত্তি আবার কেউ বলেন উড়িষ্যার উষা বা ওষা নামের ব্রতগুলির নাম থেকেই টুসুর জন্ম। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই সমস্ত উৎসবের সঙ্গে টুসুর কোন যোগ নেই। ভাদু গানের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্খাগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেই একই আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ পেল টুসু গানে। এতে কোন প্রার্থনা নেই, ভিক্ষা নেই আছে শুধু আশা পূরণের আনন্দ। সমবেত কণ্ঠে টুসু সংগীত পরিবেশিত হয়। সংগীতকালীন কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার রীতি নেই। টুসুগানের চরণ দুই থেকে তিরিশ চল্লিশও হয় তবে অধিকাংশ গানই চার থেকে দশ চরণের মধ্যে দেখা যায়। ভাদুর মত ধুয়া ধরার কোন নিয়ম নেই অর্থাৎ গানটিকে পুনরাবৃত্তি না করে টানা গেয়ে যাওয়া যায়। ভাদু হোল ফসল ফলানোর উৎসব আর টুসু হোল শস্যসম্পদ ঘরে আনার উৎসব। প্রচুর ফসল পাওয়ার আশায় ধান পোঁতার কাজ শেষ হলে সাঁওতালরা গ্রামের প্রত্যেক দেবদেবীর কাছে মোরগ বলি দেয়। একে হারিয়ার সিম বলে আর বীজ বপন সুরু হলে ঐ দেবতাদের কাছে আর এক রকমের অনুষ্ঠান করে মোরগ ও দুধ উৎসর্গ করে তাকে এরোক সিম বলে। এটি হিন্দুদের নববর্ষের সঙ্গে তুলনীয়। সাঁওতালদের সহেরা বা বাঁধনা উৎসব হোল ফসল পোঁতা শেষ হওয়ার পরব। হান্টারের মতে এটি জোহরাই অর্থাৎ প্রণাম। বাঁকুড়ায় কার্ত্তিক মাসে এবং বীরভূমে পৌষ মাসে এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। এটা অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের বাউনি বাঁধা পরবের মত। স্ত্রী পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা আছে এই উৎসবে। গোটা চৈত্রমাস জুড়ে বাহা পরব চলে অর্থাৎ শাল ফুল যখন ফুটতে আরম্ভ করে তখন থেকে। জঙ্গলের মধ্যে, পুরোহিতের পা ধুইয়ে দেবার পর পুরোহিত সে ফুল সকলকে বিরতণ করে। এই উৎসব অনেকটা

হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের ফুল দোল উৎসবের মত।

বাঙালী হিন্দুর উৎসবের সঙ্গে বাংলার প্রকৃতিগত একটা স্বভাব সঙ্গত সুসামঞ্জস্য আছে। কবে কোন্ উৎসব শুরু হয়েছিল এবং একটির পর একটি করে কে বা কারা সেগুলিকে এমন পারম্পর্য্যে গেঁথে দিয়েছে তা জানা যায় না। তবে এই উৎসবের সঙ্গে বাংলার ঋতু পর্য্যায়ের যে এক অপূর্ব্ব সংযোগ আছে, বাঙালী মনের ক্রমবিকাশে যে একটা অব্যাহত ধারা আছে তার আভাষ ইঙ্গিতে আশ্চর্য্য হতে হয়। বাঙালীর শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, উন্নত মন, সভ্যতা সংস্কৃতি সকলের সমন্বয়েএক কথায় তার মানবতার, তার বাঙালীত্বের উৎকর্ষ ও পরম পরিণতি এই উৎসবগুলিতে।

বাঙালী পূজা পার্ব্বণের তালিকা ঃ—

১) অনন্তচতুর্দ্দশী
২) অন্নপূর্ণা পূজা
৩) অক্ষয় তৃতীয়া
৪) অম্বুবাচী
৫) ইদলফেতর
৬) ইদুজ্জোহা
৭) উত্তরায়ণ
৮) কার্ত্তিক পূজা
৯) গঙ্গাপূজা
১০) গণেশপূজা
১১) গম্ভীরা
১২) চড়ক
১৩) জগদ্ধাত্রী পূজা
১৪) ঝাঁপান
১৫) ঝুলন
১৬) দশহরা
১৭) দোলযাত্রা
১৮) দুর্গাপূজা
১৯) গাজন
২০) নাগপঞ্চমী
২১) নীল বা শিবপূজা
২২) পৌষসংক্রান্তি
২৩) আমবারুণী
২৪) ফতেহা তুয়াজ দাহাম
২৫) বাসন্তী পূজা
২৬) বিশ্বকর্মা পূজা
২৭) ভীম একাদশী
২৮) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
২৯) মনসা পূজা
৩০) মহরম
৩১) মাঘী পূর্ণিমা
৩২) রথযাত্রা
৩৩) রাখীপূর্ণিমা
৩৪) রামনবমী
৩৫) রামলীলা
৩৬) লক্ষ্মীপূজা

৩৭) শনিপূজা
৩৮) শিবরাত্রি
৩৯) শীতলা পূজা
৪০) শ্যামাপূজা বা কালীপূজা
৪১) সরস্বতী পূজা
৪২) ষষ্ঠী (মাকাল, অশোক, জামাই ষষ্ঠী ইত্যাদি)
৪৩) সত্যনারায়ণ পূজা
৪৪) সবেবরাৎ
৪৫) স্নানযাত্রা
৪৬) জয়মঙ্গলবার
৪৭) বুদ্ধপূর্ণিমা
৪৮) ১লা বৈশাখ
৪৯) বড়দিন
৫০) আদিবাসী উৎসব
৫১) পীরের সিঁণি
৫২) ইতুপূজা
৫৩) ব্রতানুষ্ঠান

ব্রত কথাটির অর্থ বোধ হয় আবৃত করা বা সীমা টেনে পৃথক করা। মূল কথা, জাদু ও প্রজননশক্তির পূজা—এবং এই পূজা গ্রাম্য কৃষি সমাজের সঙ্গে একসঙ্গে সংপৃক্ত। পুরাণে ব্রতানুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায় তবে ঋগ্বেদে বা ধর্মসূত্রে ব্রতের কোন উল্লেখ নেই। বাংলাদেশে বারো মাসে একাধিক ব্রত পালিত হয়। যেমন—

বৈশাখ —পুণ্যপুকুর, শিবপূজা, মধুসংক্রান্তি, গোকাল, অশ্বত্থপট, হরিচরণ খোয়াখুয়ি, রণে এয়োব্রত ইত্যাদি।

জ্যৈষ্ঠ —জয়মঙ্গল ও সাবিত্রী

আষাঢ় —অম্বুবাচী

ভাদ্র —দুর্গাষ্টমী, তালনবমী, রাধাষ্টমী, ভাদুরি, তিলকুজারি (লক্ষ্মীপূজা)

কার্ত্তিক —কুলকুলটি

অগ্রহায়ণ—ইতুপূজা, বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী, বকাপঞ্চমী, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, তুষতুষালি, যমপুকুর ইত্যাদি।

মাঘ —তারণ, মাঘমণ্ডল।

ফাল্গুন —ইতুকুমার, উত্তমঠাকুর

চৈত্র —নবদুধের ব্রত।

এ ছাড়া সারা বছরেই ষষ্ঠীব্রত অনুষ্ঠিত হয়। যেমন—চাপড়াষষ্ঠী, জামাই-ষষ্ঠী, কাদরা, অরুণ, দুর্গা, মূলো, শেতল, অশোক, চন্দনষষ্ঠী ইত্যাদি।

আদিবাসী সমাজের পূজা-উৎসবাদি :—

মুণ্ডা —মাণ্ডা, সাহরুল, পরব, বাত্তে ইলি, ফাগুয়া, সোহরাই, করম, জিতিয়া, দেওঠান, জাহুরা, পৌষ, মাঘ পরব ইত্যাদি।

সাঁওতাল —সাকরাত, সহেরা, বাহা, মাঘাসিম, এরোকসিম, মাকমোরে, বাতউলি, যমননা ইত্যাদি।

ওঁরাও —সহরুল, গ্রামপূজা, গ্রাম বান্দা, গোয়েরা, সোহরাই, করম ইত্যাদি।

মহালি —করম, গোয়েরা, টুসু, সরুল, মাঘি, মাঘসিম, আঘাম, বাহা, সাকরাত ইত্যাদি।

ভূমিজ —সহরুল, দেশশিকারা, দলমা, করম, বুরু, মাঘপূজা, টুসু, মকরসংক্রান্তি কুদ্রা, বিশাইচণ্ডী, বরদেলা, দেওশালি ইত্যাদি।

মালপাহাড়ী—পতি, গরভু,চরক, মাঘি, জিতুয়া, বসুমতী, মহাদেও ইত্যাদি।

হো —পৌষপরব, ঘারিয়া, সহরুল, বাতাউলি, গোহাল, জম্মমা ইত্যাদি।

বীরহোড় —সোমাবংগ, নবজোম, করম, দেশাই, সোহরাই, গ্রামঠাকুর ইত্যাদি।

কোড়া —শিব, ডাক, গোয়েরা, টুসু, মাঘি ইত্যাদি।

লোধা —বরাম, বাঁধনা, জাথেল, টুসু ইত্যাদি।

মেচ —বাথাউ, সৈনাও ইত্যাদি।

রাভা —জন্মাষ্টমী, কামাক্ষা, কালী, সোয়ারি ইত্যাদি।

মঘ —শিব, দুর্গা ইত্যাদি।

টোটো —ডমচু, মণ্ডু, সারদে, গ্রামপূজা, মনক্যানিউ ইত্যাদি।

লেপচা —নামবাণ, মালে, টনটেন ইত্যাদি।

গারো —তাতারারাবগা, চোরাবুদি, নোপানতু, সালজোং, কালসে, সুসিম, নোয়াং ইত্যাদি।

ভুটিয়া —লোসার।

বাঙালীর প্রধান পূজা দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা বসন্ত ও শরৎ দুই ঋতুতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে ভিন্ন নামে। বসন্তের পূজাকে বাসন্তী আর শরতের পূজাকে শারদীয়া বলে। বাসন্তীপূজা অপেক্ষা শারদীয়াপূজার প্রচলন অনেক বেশী;

ধুমধামও ততোধিক। প্রায় চারশো বছর আগে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এই পূজার প্রথম প্রচলন করেন। পুরাণে তিনিই চণ্ডী, পার্বতী, উমা, অভয়া ; তিনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া, নারায়ণীশক্তি, মহিষাসুরমর্দ্দিনী। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ; তিনিই নিদ্রা, তৃপ্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, লজ্জা; তিনি দক্ষকন্যা, মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী; তিনিই সূর্য্য-চন্দ্র-দেবতা ব্রাহ্মণের আরাধ্যা। তিনি রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকশ্রেণীর লভ্যরূপিণী, শস্য প্রসবিনী, গৃহীর গৃহদেবতা। তিনিই বিশ্বরূপা মহাশক্তি। তাই শারদ প্রভাতে শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়ে মর্ত্ত্যবাসী তাঁকে আহবান জানায়। তাঁর জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত। ঢাকের বাজনা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা আনন্দে মেতে ওঠে ; ধনী নির্ধন নির্বিশেষে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও নূতন নূতন জামা কাপড় পরে। তাঁর আরাধনায় মানুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রেম প্রীতি ভালবাসায় আবদ্ধ হয়। পূজামণ্ডপে নাচ-গান, থিয়েটার যাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। চারদিন পূজার পর দেবীকে নদী বা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পুরুষেরা পরস্পর আলিঙ্গন করে, ছোটরা বড়দের প্রণাম করে। বনদুর্গা ও জয়দুর্গা নামে দুই দেবতার পূজা কোন কোন স্থানে আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার সঙ্গে কলাবউ বা নবপত্রিকা পূজার কোন যোগ নেই তত্রাচ বহুকাল থেকেই কলাবউ দুর্গাদেবীর সঙ্গে পূজিতা হয়ে আসছেন।

দুর্গাপূজার সাত দিন পরেই আরম্ভ হয় লক্ষ্মীপূজা। সার্ব্বজনীন ছাড়াও বাঙালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আদর প্রবল। তিনি ধনভাণ্ডারের দেবী তাই তিনি সর্বত্র পূজিতা। প্রতি বৃহস্পতিবার মেয়েরা বারোমেসে লক্ষ্মী পূজা করে থাকেন। তিনিই আবার ধান্যলক্ষ্মী। স্ত্রীলোক অন্তঃসত্বা হলে যেমন সাধভক্ষণ করানো হয়, তেমনি ধানের গর্ভে শীষের আবির্ভাব ঘটলে পূর্ণগর্ভা ধান্যলক্ষ্মীকে পূজা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। নূতন ধান ঘরে নিয়ে এসে প্রথমে গৃহদেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। তারপর চালের (আতপ) সঙ্গে ঘি, মধু, দুধ, ফলমূলাদি, নূতন গুড় দিয়ে নৈবেদ্য তৈরি করে পূজা করা হয় এবং পূজাশেষে প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হয় এই বলে 'নবান্ন সইল—সইল'। তাই এই উৎসবের নাম নবান্ন। অনেকে কার্তিকমাসে অমাবস্যায় কালীপূজার দিন লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীর পূজা করে থাকেন। গোবর দিয়ে অলক্ষ্মীর মূর্তি এবং পিটুলি দিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি তৈরি করা হয় এবং পূজা শেষে কলার

পেটোতে করে অলক্ষ্মীর মূর্তি চৌরাস্তায় ফেলে দিয়ে বলে 'লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূরে যা।'

কালীপূজা সর্বভারতীয় পূজা। সমগ্র ভারতবাসীই এই পূজা করে থাকেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রথায়। তিনি একাধারে ভয়ঙ্কর অন্যদিকে স্নেহময়ী জননী। তিনি জগদীশ্বরী; তাঁর আরাধনা করে বহু গৃহী যোগী হয়েছেন, বহুযোগী অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে জগতে অমর সাধক হয়েছেন। এই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বাঙ্গালীর চেষ্টার ত্রুটি নেই। এই দিনেই হয় বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব দেওয়ালী বা দীপাবলী। গৃহে, মন্দিরে, দেবতার স্থানগুলিতে, বৃক্ষ-মূলে সর্বত্রই দীপদান করা হয়। অনেকে মনে করেন, দীপান্বিতা উৎসবের মাধ্যমেই মৃত পিতৃপুরুষগণের যমলোক থেকে স্বর্গলোকে চলে যাওয়ার পথ সহজ হয়। বাজী পোড়ানো বাঙ্গালীর দেওয়ালী উৎসবের আর এক প্রধান অঙ্গ।

বিষ্ণুপূজা উপলক্ষে যে সমস্ত পূজাপার্বণ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে প্রাচীনতম হোল অক্ষয় তৃতীয়া ও অনন্তচতুর্দশী এবং তা ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

কৃষ্ণের জন্মোৎসবই জন্মাষ্টমী। এই উৎসব ভাদ্রমাসে পালিত হয় এবং এটি সর্বভারতীয় উৎসব। কৃষ্ণকে নিয়ে আরও অনেক উৎসব আছে। যেমন—দোল-যাত্রা, ঝুলনযাত্রা ও রাসযাত্রা ইত্যাদি; এগুলি খুবই জনপ্রিয়।

শিবের উৎসবের মধ্যে শিবরাত্রি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটিও সর্বভারতীয় উৎসব। ফাল্গুনমাসে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ রাত্রি জাগরণে শিব পূজা করেন। অনেকে মাসাধিককাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিয়ে হবিষ্যান্ন খান। চৈত্রমাসে পুত্রবতী নারীদের নীলের উপবাস অতি পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হয়।

গম্ভীরা ও শিবের গাজনের মত চড়কপূজা হোল আর একটি উৎসব—স্থান-কালভেদে শুধু নামান্তর ঘটে। চড়কপূজার ব্যাপক প্রচলন ওপার বাংলায় দেখা-যায়, তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এর আধিপত্য সুপ্রচুর। সারা চৈত্রমাস ধরে এই উৎসব চলে। অনেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করে হবিষ্যান্ন খান আবার অনেকে বাণ বা বঁড়শির ফোঁড় গায় বিদ্ধ করে বা আগুনে, কাঁটায় বা লোহার পাতে বা বঁটির উপর ঝাঁপ দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন।

চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে অন্নপূর্ণার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই পূজার ব্যাপক প্রচলন নেই এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জগদ্ধাত্রী পূজাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং প্রচলনও খুব কম। তবে চন্দননগরে

ও কৃষ্ণনগরে এই পূজা প্রচণ্ড ধুমধাম সহকারে হয়ে থাকে এবং প্রচুর জনসমাগম হয়। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের পূজার অস্তিত্ব চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায় [শূলপানি]। তবে অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অবস্থিত একটি কার্ত্তিক মন্দিরের উল্লেখ রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিকপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পূজা হুগলী জেলার চুঁচুড়াতে ব্যাপকভাবে হয় এবং বিসর্জন দেওয়ার দিন বহুলোকের আবির্ভাব ঘটে।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা হয়। এই দিন গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে উনান পূজা বা মনসা পূজা হয়ে থাকে। এই দিনই অরন্ধন পালিত হয়ে থাকে। উনানপূজার জন্য সেদিন রান্না বান্না হয় না এবং সেজন্য আগের দিন রাত্রে পরদিনের জন্য রান্না করা হয়। পূজা শেষে হয় আহারাদি।

ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু খোসপাঁচড়ার দেবতা। ফাল্গুন মাসে এই পূজা হয়ে থাকে। ঘেঁটুর গান গেয়ে অনেক ছেলেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল, পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

বসন্তরোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য শীতলাদেবীর পূজা বাংলায় সর্বত্র হয়। অনেকে এই দেবতাকে মানুষ খেকো বা কাঁচাখেকো দেবতা বলে থাকেন। নদী-খাল-বিলবহুল এবং জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে সাপের উপদ্রব চিরকালের। যদিও শহর সভ্যতার আলোকে এই উপদ্রব প্রশমিত। কিন্তু সাপের ভয় কার না আছে? তাই সর্পদেবতা মনসাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা সকলেই করেন। তবে শহর অপেক্ষা গ্রামেই এই পূজা বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে।

মাঘমাসে শুক্লা পঞ্চমীতে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। বিদ্যার দেবতা, সেই হেতু ছাত্রসমাজের প্রধান উৎসব। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তিতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে একদা ভারতের সর্বত্র সূর্য্যপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তেমন কোন প্রচলন নেই। সূর্য্যপূজার নিদর্শন হিসাবে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বেঁচে আছে ইতুপূজা। এই পূজা কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ হয় এবং একমাসকাল পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে যে সমস্ত ব্রতকথা প্রচলিত আছে তারমধ্যে রূপনা-ঝুপনা, বেহুলা-লখিন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, শ্রীমন্তসদাগরের কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

পূজা-পার্বণ ছাড়াও বাঙালী কতকগুলি উৎসবের সঙ্গে পরিচিত যেগুলি পূজা বলে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন হোলি, বসনরা বা মাগন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ইত্যাদি। বসন্তকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বাংলাদেশে সর্বত্র হোলি উৎসব

উদ্‌যাপিত হয়। এইদিন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ করে পূজা করা হয়। তাই এই উৎসবের আর এক নাম শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। মণ্ডপে বা বাড়ীতে একটি দোলনায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ রাখা হয়। উপরে চন্দ্রাতপ এবং গৈরিক ধ্বজা উত্তোলিত হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে মুঠো মুঠো আবীর ছড়ায়। সেই আবীর নিয়ে বাড়ীর লোকেরা বা প্রতিবেশীরা মাখামাখি করে। এইদিন কোথাও কোথাও অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণের নামগান বা লীলাকীর্ত্তন হয়। কোথাও আবার অশ্লীল বাক্যের নৃত্যগীত, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন, সঙ্‌সাজা, জুয়াখেলা, জলকাদার ছড়াছড়ি দোল বা হোলির নামে হয়ে থাকে যা মোটেই সমাজ স্বীকৃত নয়। এই উৎসবের রূপ দেশকালে ভিন্ন ভিন্ন। দোলের আগের দিন যে উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাকে কোথাও নেড়াপোড়া, কোথাও চাঁচর, আবার কোথাও বহ্নু উৎসব বলে। বাঁশ ও খড়কুটো দিয়ে মানুষের প্রতিমূর্ত্তি তৈরি করে আগুনে দগ্ধ করা হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ আগুন জ্বলে ততক্ষণ পর্যান্ত ছেলেদের হৈ-হুল্লোড় করে এমনকি গালিবর্ষণও চলে। এটিকে অনেকে বর্ষাবিদায়ের উৎসব বলে। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নূতনের আহ্বান।

শীতলার মাগন, পাঁচপীরের মাগন, সিন্নীর মাগন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালী নারীরা ব্রত উদ্‌যাপন করে থাকেন। এই ব্রতের উদ্দেশ্য হোল জন্তু জানোয়ারদের, রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধান-চাল ইত্যাদি চেয়ে বা মেগে এই ব্রত উদ্‌যাপন করা হয় বলে, এই ব্রতের নাম মাগন। অনেকে আবার বাসন্‌রা আখ্যাও দিয়ে থাকেন। এই ব্রতের একটি অঙ্গ হোল কলা-বিবাহ। যেমন নারীপুরুষের বিবাহ হয় ঠিক তেমনিভাবে এই কলাগাছের মধ্যে বিবাহের সমস্ত লৌকিক আচারাদি পালন করা হয়ে থাকে। পুরোহিত যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিবাহ দেন। মেয়েরা একদল হয় বরযাত্রী অন্যদল কন্যাযাত্রী। বিবাহে বাদ্যগীতও হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গে বসন্‌রা হোল বসন্তরোগের দেবতা—বসন্‌রা ঠাকুর।

পৌষমাসে হিন্দুদের ঘরে ঘরে চলে পৌষপার্বণ বা পিঠা-পরব। চাল, ক্ষীর, দুধ, নারিকেল, গুড়, রাঙালু [রাঙ্গা আলু] প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে পিঠা তৈরি হয়—চন্দ্রপুলি, দুধপুলি, পাটিসাপটা, আঁসকে, ভাজা ও সিদ্ধ পিঠা, রসবড়া ইত্যাদি। গঙ্গাস্নান এবং সূর্য্যের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার উঠানে পিটুলির পাঁচটি ছাপ সে আর এক অনুষ্ঠান। অনেক সময় লাল রঙয়ের ছাপ গরুর গায়েও দেওয়া হয়ে থাকে। বউনী বাঁধা পৌষমাসের আর এক উৎসব। গৃহে গৃহে

গৃহিণীরা খড়ের কুটো দিয়ে সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধে। এর অর্থ হোল গৃহলক্ষ্মীকে বেঁধে রাখা।

ভাইফোঁটা অতি প্রাচীন উৎসব। ভাইকে খাওয়ানো বা আদর আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে ভাই বোনের সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়। এই ধরণের আর একটি উৎসব যা খুব জনপ্রিয় এবং প্রতি বাড়ীতেই উদ্‌যাপিত হয় তা হোল জামাইষষ্ঠী। জামাতার মঙ্গলকামনাই এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। কেননা জামাতার মঙ্গলই কন্যার মঙ্গল। বর্ত্তমানে আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই উৎসবের জৌলুষ অনেক কম।

বিবাহ :—

বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হোল দেহগতভাবে নরনারীর সমাজস্বীকৃত মিলন। সন্তান উৎপাদন এবং সমাজস্বীকৃতভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নীতিগত ভাবে পিতামাতার উপর বর্ত্তায়। প্রত্যেক দেশেই কিভাবে পিতামাতা তাদের সন্তানদের গড়ে তুলবে তার শিষ্ট আচার সমাজে বিদ্যমান এবং সেইমত প্রত্যেক পিতামাতাই সে ব্যাপারে সাধ্যমত সচেষ্ট হয়ে থাকেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিবাহ প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ বাড়িয়ে দেয়। সেইজন্য মানুষের জীবনে বিবাহ শ্রেষ্ঠকৃত্য বলে গণ্য হয়ে থাকে।

আর্য্যরা নিজেদের জন্য বিবাহের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে আইনকানুন করতে গিয়ে ধর্মান্তরিত আর্য্যদের (অনার্য্য থেকে আর্য্য) এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য কিছু কিছু আইন তৈরি করেছিলেন। অবশ্য সেখানে তাঁদের কিছুটা স্বার্থও ছিল। তাঁদের বিধান অনুযায়ী যে কোন আর্য্য নিজেদের ইচ্ছানুসারে যে কোন সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন কিন্তু কোন ধর্মান্তরিত আর্য্য ও ভিন্ সম্প্রদায়ের মানুষ আর্য্যকন্যা বিবাহ করতে পারবেন না। কালক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনার্য্যদের আর্য্য হওয়ার প্রাবল্যে আর্য্যসমাজে বর্ণভেদ প্রথা চালু হয় এবং তাঁরা নিজেদের গাত্রবর্ণ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যেমন, পুরোহিত, রাজন্য ও বৈশ্য। বিবর্ত্তনের ফলে আবার এই তিনবর্ণের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার গাত্রবর্ণ দেখা দিতে থাকে এবং বিভিন্ন গাত্রবর্ণে সমস্ত সম্প্রদায় একাকার হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় শূদ্রবর্ণের। এই চারবর্ণের অধিবাসীরা কিভাবে বাংলায় ছত্রিশজাতি এবং তপশীলীজাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় তা বিশদ আলোচনার

দাবী রাখে। এইভাবে চারবর্ণের সৃষ্টি হলেও বিবাহের ব্যাপারে পুরোহিতগণ যে কোন সম্প্রদায়ের কন্যার পাণিগ্রহণের অধিকারী বলে ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়ায় আরও বলা হয় যে রাজন্যসম্প্রদায় পুরোহিত সম্প্রদায় ছাড়া আর যে কোন সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন এবং অনুরূপভাবে বৈশ্য সম্প্রদায় উপরোক্ত দুই সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ করতে পারবেন কিন্তু আর্য্যকৃত অনার্য্যরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে বা নিজবর্ণে বিবাহ করতে পারবেন। ফলে দেখা গেল যে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যালাভে কোন অসুবিধা দেখা গেল না; রাজন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই অসুবিধা খুব একটা প্রকট হোল না। অসুবিধার মধ্যে পড়লেন বৈশ্য সম্প্রদায় কেননা পুরোহিত এবং রাজন্য সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুশ্রী বা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বিবাহ করে বসতেন। এর শিকার হলেন আর্য্যকৃত অনার্য্যেরা। বিবাহ বিষয়ক এই ফতোয়া বা প্রথার নাম অনুলোম এবং এই প্রথার বিপরীত নাম প্রতিলোম যা পরে আর্য্যশাসিত সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অনুলোম প্রথা চালু হওয়ার পর যেটা অসুবিধা দেখা দিতে থাকল সেটা হচ্ছে যে এতে যেমন সুবিধা হোল পুরোহিত ও রাজন্য সম্প্রদায়ের পুরুষদের তেমন অসুবিধা হোল কন্যাদের, আর অসুবিধা হোল বৈশ্য ও আর্য্যকৃত অনার্য্য পুত্রদের। একদিকে উচ্চ বংশীয় কন্যাদের জন্য পাত্র পাওয়া যায় না, অপর দিকে নিম্নবর্ণের পুত্রদের জন্য কন্যা মেলে না। ফলে উচ্চ বংশীয় পুত্রেরা যৌথবিবাহ করে চললেন আর কন্যারা বহুপতি বিবাহের আশ্রয় নিলেন। কিছু কিছু এই ব্যবস্থা চলার পর এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে লাগল খুব স্বাভাবিক কারণে। অনুলোম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণের যুবতী ও নিম্নবর্ণের যুবকদের প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দেয়: তাছাড়া, নিম্নবর্ণীয়েরা পশুপালক আর্য্যদের যজ্ঞ এবং জড়শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধেও প্রচার অভিযান চালাতে থাকে কিন্তু বিশেষ ফল হয় নি বরং এরকম ধারণা বা সংস্কার অনেকের মনেই উঁকি দিতে থাকে যে অপর সম্প্রদায়, বিশেষতঃ নীচ সম্প্রদায় থেকে কন্যা গ্রহণ অগৌরবের ব্যাপার নয়, অনেকস্থলে গৌরবের। কিন্তু কেউই স্ব ইচ্ছায় কারোর কন্যাকে গ্রহণ করতে পারতেন না। বিরুদ্ধপক্ষদের পরাস্ত করে অর্থাৎ জোর-পূর্ব্বক অন্য সম্প্রদায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে সমর্থ হলে সেই বিবাহ তখন সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হোত। পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজে আবার

নূতন করে অনুলোম প্রথা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই চেষ্টার মূলেও ছিল নিজ নিজ কন্যাদের সংরক্ষণের মনোভাব। তাঁরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা প্রাচীন নজির তুলে ধরে সকলকে বোঝাতে চাইলেন যে স্ত্রীরত্ন যে কোন সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করা যায় কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ে কন্যার বিবাহ কখনই সম্ভব নয়। তাঁরা এইভাবে বোঝাতে চাইলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে লেখা আছে যে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ট চণ্ডালকন্যা অক্ষমালাকে বিবাহ করেছিলেন, শান্তনু বিবাহ করেছিলেন দাসকন্যা সত্যবতী বা গন্ধকালীকে। এইভাবে বিবাহ করা ছাড়াও অপহরণ করে বিবাহ করার কথাও শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিনীহরণ, অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ, কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা হরণ প্রভৃতি। দেবরাজ ইন্দ্র জোর করে পুলোমার কন্যা শচীকে বিবাহ করেছিলেন অর্থাৎ যুদ্ধে তাঁর পিতাকে পরাস্ত এবং নিহত ক'রে। চন্দ্র অপহরণ করেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে দেবগণের সঙ্গে চন্দ্রের বিবাদ হয় এবং অসুরগুরু শুক্র চন্দ্রের পক্ষ নেয়। অনেকদিন যুদ্ধ চলার পরও যখন দেবগণ চন্দ্রকে পরাস্ত করতে পারলেন না তখন ব্রহ্মা মধ্যবর্ত্তী হয়ে দু'দলের আপোষ রফা করলেন এবং পরোক্ষভাবে তাতে চন্দ্রের জয় হয়। জোর করে বিবাহ করা ছাড়াও প্রতিজ্ঞাকারে বা ভুলিয়ে ভালিয়ে বিবাহ করার নানান কাহিনী প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যত্রতত্র আছে। পুরুরবা উর্ব্বশীর কাছে কয়েকটি শর্ত পালনের অঙ্গিকার করে বিবাহ করেন। কিন্তু পুরুরবা শর্ত পালনে অক্ষম হলে উর্ব্বশী পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরুরবাকে ছেড়ে চলে যান। শান্তনুও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পত্নীরূপে পেয়েছিলেন কিন্তু তিনিও অঙ্গীকার পালনে অসমর্থ হলে গঙ্গাদেবী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। যযাতি দেবযানী উপাখ্যানে জানা যায় যে যযাতি গোপনে অসুর রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার প্রণায়াসক্ত হওয়ায় শুক্রকন্যা দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এ ধরণের বিবাহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অল্পবিস্তর চালু ছিল তার কারণ হিসাবে এ কথা বলা যায় যে প্রাচীনযুগে সর্ব্বত্রই মেয়েদের অভাব। আরও লক্ষ্য করা যায় যে সেযুগেও মহিলারা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারিণী ছিলেন এবং সেইযুগে স্ত্রীগণ-স্বামীদের পরিত্যাগ করেছেন আবার স্বামীরাও স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করেছেন। যেমন, জরুৎকারু তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য। রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। অর্থাৎ

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় স্ত্রীবর্জ্জনের পালা। তার আগে অবশ্য স্ত্রীরাই স্বামীকে পরিত্যাগ করতেন এবং তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেই স্বামী বা পুরুষদের চলতে হোত। ভারতবর্ষের অনেক অধিবাসীদের মধ্যে এখনও এই লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন নায়ার সমাজের মহিলাগণ স্ববর্ণের নানা পুরুষে বিহার করে থাকেন। কে কার পুত্র কেউই বলতে পারে না সুতরাং ভাগিনেয় হয় মাতুলের বিষয়াধিকারী। বহু উপজাতির মধ্যে এরূপ স্বচ্ছন্দ বিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে উত্তর কুরু দেশে এ ধর্ম প্রচলিত আছে। উত্তর কুরু বলতে প্রাচীন আর্য্যেরা উত্তর ভারতের কোন এক ভূমিখণ্ডকে বুঝতেন। বোধ হয় এইস্থান আদিম আর্য্যদিগের বাসস্থল। যদি তা না হয় তবে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে অতি পূর্ব্বকালের আর্য্যপুরুষেরা যদৃচ্ছবিহারী ছিলেন। মহাভারতের যুগে বা সত্যযুগে সন্তান উৎপত্তিতে স্ত্রীসংসর্গের কোন প্রয়োজন হোত না। শান্তিপর্বে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন যে ঐ সময় ইচ্ছা করলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করতে পারত। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না। তৎকালেও কামিনীগণকে স্পর্শ করলে তাঁদের গর্ভে পুত্র জন্মলাভ করত। দ্বাপরযুগ থেকে মৈথুন ধর্ম প্রচলিত হয় এবং হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।

বর্ত্তমানে অনেক উপজাতি সমাজে যুবক যুবতীদের মিলতে দেওয়া হয়। রাত্রে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের একত্রিত থাকতে দেওয়া হয়। যে স্থানে তারা মিলিত হন তাকে ঘুমঘর বা ঘটুল বলা হয়। এই ঘটুলে যুবক যুবতীদের সর্ব্বপ্রকার মিলনে কোন বাধা নেই। এইভাবে মিলনে কোন নারী গর্ভবতী হলে তাতে কোন লজ্জার কারণ নেই। দলের মধ্যে বিবাহ অন্তর্বিবাহ এবং দলের বাইরের বিবাহ বহির্বিবাহ। সাঁওতাল সম্প্রদায় অন্তর্বিবাহকারী দল। সাঁওতালদের গোত্র বারটি। একই গোত্রের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ সাঁওতাল সমাজে নিষিদ্ধ। সুতরাং গোত্রদল হিসাবে সাঁওতাল বহির্বিবাহকারী দল। বিবাহের আলোচনায় সাঁওতালদের কখনও অন্তর্বিবাহকারী দল আবার কখনও বহির্বিবাহকারী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্তর্বিবাহ যেভাবে সমাজের অনুমোদন পায় সেইভাবেই বহির্বিবাহ সামাজিক অনুমোদন লাভ করে। বহির্বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নানা কারণ বিদ্যমান। যেমন অনেকের ধারণা অন্তর্বিবাহে মন মিলন প্রয়াসী হয় না। তাই রক্তের সম্পর্কহেতু অথবা

পারিবারিক বন্ধনের ঘনিষ্টতাহেতু আত্মীয় বিবাহ পরিহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, গোত্রবিভক্ত সমাজ সগোত্রে বিবাহ হলে গোত্রদেবতা অথবা পূর্ব্বপুরুষ রুষ্ট হয়ে দম্পতিকে নানা বিষাদের মধ্যে টেনে নিয়ে যান। নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের অভাবও অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে।

হিন্দু বিবাহাচারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যাচার ঢুকে পড়লে ধর্মসূত্রকারেরা আট প্রকার বিবাহের বিধান দিলেন। এই আট প্রকারের বিবাহের মধ্যে মাত্র চারপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস বিবাহের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। প্রথম প্রকার বিবাহে মন্ত্রের উচ্চারণ দরকার হোত কিন্তু বাকি তিনপ্রকারের মন্ত্রের কোন বালাই ছিল না। মহাভারতের যুগের পর স্মৃতিকারেরা আরও চারপ্রকার বিবাহের আমদানী করলেন। মোট আট প্রকারের বিবাহের রূপ হোল এই ঃ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই বিবাহের চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে কন্যাকর্ত্তা পাত্রের স্বভাব চরিত্র, বংশ, শিক্ষা, মর্য্যাদা বিচার করে যে কন্যার বিবাহ হয় তার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ; পুরোহিতকে কন্যা দান করলে হয় দৈব; শুল্ক গ্রহণান্তে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় আর্য্য আর পাত্রকে ধনাদি দ্বারা আকৃষ্ট করে যে বিবাহ তা প্রজাপত্য বলে খ্যাত; কন্যাক্রয় করে বা লোভ দেখিয়ে আসুর বিবাহ, বর ও কনের মতামত নিয়ে হয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ, বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করার বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ আর নিদ্রিত বা অসতর্ক অবস্থায় কন্যাকে রমন করার পর যে বিবাহ তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানবহুল ব্যাপার। সাধারণতঃ, ধর্মসাক্ষী করে স্বামী স্ত্রী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ হিন্দুর দশম সংস্কারের মধ্যে অন্যতম সংস্কার। এ কার্য্য দিনের বেলায় হওয়াই শাস্ত্রসঙ্গত কিন্তু বাঙালী হিন্দু বিবাহ দিনের বেলায় হয় না, হয় রাত্রে। তবে এই বিবাহ সাধারণতঃ দিন ও রাত্রির সঙ্গমকালে বা গোধুলি লগ্নে হওয়া প্রশস্ত বলে অনেকে মনে করেন। মারাঠী ও পারসীদের বিয়েও সাধারণতঃ গোধুলি লগ্নেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। খৃষ্টান, মুসলমান ও দক্ষিণ ভারতের বহু সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দিনে। আগে হিন্দু বাঙালীর বিবাহও দিনে অনুষ্ঠিত হোত। বৌদ্ধ, জৈন বিবাহ দিন বা রাত যখন খুশী অনুষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ পঞ্জিকার শাসন সমস্ত দেশকেই নিয়মনিষ্ঠ করেছে। প্রাচীন বিবাহে অবশ্য বরকন্যার রাশি গণনাদি, লগ্ননির্ণয় অথবা নৈশ বিবাহের প্রথা অনুসৃত হোত না। বৈদিক গৃহ্যসূত্র ও মনু প্রভৃতি

গ্রন্থে বরকন্যা বিবাহের সময় তাদের বংশমর্য্যাদা, গুণাবলী, রাশি ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্ণযৌবনা নারীর বিবাহ হোত এবং ক্ষত্রিয়াদি প্রভৃতি বীরজাতিরা গান্ধর্ব্ব, প্রজাপত্য, দৈব ও রাক্ষস বিবাহ করতেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে দৈব ও প্রজাপত্য বিবাহ চলত। প্রজাপত্য বিবাহে যেমন বর ও কন্যার অনুমতির প্রয়োজন হোত গান্ধর্ব বিবাহে তেমনটি দরকার হোত না। তবে প্রজাপত্য বিবাহে বর ও কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনয়ন করার পর অভিভাবকের অনুমতির দরকার হয়। তাঁরা যদি সম্মত হতেন তবেই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারত।

বাঙালী হিন্দুর জীবনে বৈদিকধারার প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে। যদিও অবিকৃত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন খুব অল্পই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কালক্রমে ধর্মকর্মের যেমন অনেক কিছুই পরিহার হয়েছে আবার সংযোজিতও হয়েছে কিছু কিছু। ঋগ্বেদের যুগে গ্রামভিত্তিক নিয়মের উপর বিবাহ অনুষ্ঠিত হোত। বিভিন্ন গ্রামের পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধ ঠিক করত দিধিষু নামে একশ্রেণীর লোক। ভিন্ন গ্রাম থেকে কন্যা বহন করে আনা হোত বলে তাকে বধূ বলা হয়ে থাকে। বিবাহকালীন ও বিবাহোত্তর আচার ব্যবহারে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে অন্য ভাষাভাষি হিন্দুর অনেক তফাৎ। যেমন বাঙালী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় রাত্রে, অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের হয় দিনে ; বাঙালী বধূর শাঁখা সিন্দুর অপরিহার্য্য, অন্যদের কাছে তা নয়; বাঙালী বিধবা সমস্ত ভূষণাদি পরিত্যাগ করে একাহারে জীবনযাপন করেন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় বিধবারা পরেন লাল শাড়ী এবং একাহার বা অন্যান্য নিয়ম পালন করেন না। কিন্তু যেদিন বাঙালী উত্তর ভারতীয় রাজনীতির কিছু গ্রহণ করল, কিছু বর্জ্জন করল সেদিন তাদের জীবন ও বিবাহে অভিনবত্ব এল—অভিনব সাজ, ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও মিল। এই মিলনই সমগ্র সমাজকে বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বেঁধে রাখলো। তাই বর্ণভেদে বিবাহাচারে কিছু পার্থক্য থাকলে সমস্ত বাঙালীর বিবাহে একটা মিল লক্ষণীয়।

বৈদিকযুগে যেভাবে বিবাহ নিষ্পন্ন হোত এখনও সে ধারা প্রায় অপরিবর্ত্তিত। তখনও বরকে কনের বাড়ী গিয়ে বিবাহ করতে হোত, এখনও হচ্ছে। তখনও বিবাহান্তে সালঙ্কারা কন্যাকে শ্বশুরদত্ত যৌতুকাদিসহ বরণ করে স্বামীগৃহে তোলা হত, এখনও হচ্ছে। বিবাহে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা তখনও ছিল এখনও আছে। শ্বশুরালয়ে বধূ তখনও কর্ত্রীর মর্য্যাদা পেতেন, এখনও পান। সংসারের

অপরাপর লোকেদের উপর প্রভাব বিস্তার ও সমাদর দুই সময়েই সমান। কিন্তু সেই সময় বিবাহের বয়সসীমা কত ছিল তা জানা যায় না।

চৈতন্যোত্তর যুগ থেকে কণ্ঠীবদল বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বাঙালীর বোষ্টম সমাজে। এই বিবাহ অনেক সময় অভিভাবকেরা ঠিক করেন। আবার অনেক সময় পাত্রপাত্রী নিজেরাই ঠিক করেন। পতিত নরনারীও বোষ্টম সেজে এ ধরণের বিবাহ করে থাকেন। আদর্শ হিন্দুবিবাহের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয় যে সকলকে স্বজাতিতে পূর্ব্বকল্প বিবাহ করতে হবে। অবশ্য অসবর্ণ বিবাহ হতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে পাত্রকে উচ্চবর্ণীয় হতে হবে। বাঙলার ব্রাহ্মণাদি ছত্রিশ জাতির সকলের ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। অন্য বর্ণের ভার্য্যা গ্রহণ, কামনা বাসনা পরিপূরণের জন্য সমর্থিত। সামাজিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত পুত্রেরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(.) নিজ উৎপাদিত (২) পর উৎপাদিত কিন্তু যার উপর নিজ দাবী বর্ত্তমান (৩) পোষ্যপুত্র। পিতামহদির ধনের উত্তরাধিকারীকে বলা হয় গোত্র দায়াদ। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রজ ও ঔরস উভয়বিধ সন্তান থাকলে ঔরসপুত্রই পিতৃধনের অধিকারী, তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বারা প্রতিপালন করতে হবে। শূদ্রা পত্নী বা উপপত্নীতে উৎপাদিত সন্তানও নিজ সন্তান বলে বিবেচিত হবে [মনু ৯।১৬০] নিজ পত্নীতে অন্যের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজ। ক্ষেত্রজ পুত্র অনেকটা নিয়োগ পুত্রের মত। কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র কানীন। কৌটিল্যের মতে ক্ষেত্রজ পুত্র হচ্ছে দ্বিষিক বা দ্বিগোত্র। বীজীপিতা ও সামাজিক বা ক্ষেত্রীপিতা উভয়েরই তার উপর দাবী আছে [অর্থশাস্ত্র ৩।৭।৬, ১৭]। দায়বিভাগের ব্যাপারে সমস্ত স্মৃতিকার একমত নন। মনুর মতে ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী তবে এদের অভাবে দত্তকপুত্র, তার অভাবে অপবিদ্ধ পুত্র, এবং তারও অভাবে কানীনপুত্র ইত্যাদি [মনু ৯।১৬৫] অধিকারী হয়ে থাকে।

মুসলমানদের বিবাহ হচ্ছে শাদী, পুনর্বিবাহ নিকা। মুসলমান পুরুষ ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলমান রমণী বিবাহ করতে পারেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলমান নারীর পক্ষে অমুসলমান বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের আলোচনায় প্রথমেই মনে আসে জাতি, বর্ণ, বংশ, কৌলিন্য, আভিজাত্য ও গোত্রাদি বিচারের কথা কিন্তু মুসলমানদের গোত্র বিভাগ নেই, জাতি বিভাগ আছে। সুতরাং দেখা যায় যে গোত্র বা বর্ণ বিচারের কড়াকড়ি না থাকলেও বংশ, আভিজাত্য, কৌলিন্য প্রভৃতির বিচার করা হয়। পাত্রপাত্রীর নির্ব্বাচনের পর বিবাহ ঘটাতে হলে

দু'টি রোকন পালনীয়। রোকন দুটির প্রথমটি ইজাব ও দ্বিতীয়টি কবুল। ইজাব বলতে বোঝায় প্রথম পক্ষের প্রস্তাব ও কবুল হচ্ছে তার সমর্থন। এ ছাড়াও আছে দশটি শর্ত—[১] পাত্র বুদ্ধিমান ও পাত্রী বুদ্ধিমতী হওয়া চাই [২] উভয়ের মধ্যে একজন পুরুষ অপরজন মহিলা হওয়া চাই [৩] দুলহা-দুলহিন উভয়ের অথবা তাদের অলি ইজাব-কবুল নিতে পারেন [৪] দুজন পুরুষ সাক্ষীর সম্মুখে ইজাব-কবুল করতে হবে [৫] দুলহিনের সম্মতি থাকা চাই [৬] ইজাব কবুল এক মজলিসে হওয়া বাঞ্ছনীয় [৭] ইজাব কবুলে স্থিরিকৃত দেনমোহরের কমবেশী না করা [৮] সাক্ষীগণের উপস্থিতি এবং তাদের নিজ কানে ইজাব কবুল শুনে নেওয়া [৯] দুলহিনের সমস্ত শরীর লক্ষ্য করে কবুল করা দরকার [১০] দুলহা-দুলহিনের সম্পর্কে সাক্ষীদের পূর্ব্বেই অবগত থাকা। অবশ্য ইজাব-কবুল হলেই বিয়ে হয়ে যায় তবুও এই সর্ত্তসমূহ প্রতিপালিত না হলে ইসলাম মতে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। মুসলমান বিবাহে দেনমোহর আবশ্যকীয় অঙ্গ। এ ছাড়া বিবাহের অন্য পদ্ধতিও আছে। এই বিবাহে কাবিন নাম পেশ করতে হয়। কাবিন নামটি এরূপ ঃ

[১] উক্ত দেনমোহরের টাকার অর্দ্ধেক অমুক বিবির তলবমাত্র প্রদান করব—বাকী অর্দ্ধাংশ এই বিবাহ স্থির থাকা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব। তাতে কোন রকম ওজর আপত্তি করতে পারব না। এরূপ হলে অমুক বিবি আদালতের আশ্রয় নিয়ে আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে আদায় করতে পারবেন। তাতে আমার ও আমার ওয়ারিশনের কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

[২] অমুক বিবিকে শরাশরিয়ত মোতাবেক পর্দানবিশী রেখে যথারীতি ইসলাম ধর্মনীতি শিক্ষা দেব এবং তাহার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করব। কোন প্রকার গালিগালাজ বা প্রহার করব না।

[৩] অমুক বিবির বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারব না। যদি অমুক বিবি বন্ধ্যা বা চিররুগ্না হন, তা হলে তার অনুমতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করব।

[৪] আনন্দ বা শোক উপলক্ষে অমুক বিবিকে পিত্রালয়ে পাঠাতে বাধ্য থাকব।

[৫] অমুক বিবির সঙ্গে আমার পিতামাতার যদি বনিবনা না হয় এবং তাতে যদি পিতামাতার দোষ ক্রুটী প্রমাণিত হয় বা অন্য কারণে বিবি যদি

নিজ পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক হন, তা তিনি অনায়াসে করতে পারবেন এবং আমি তাঁর খোরপাষ দিতে বাধ্য থাকব।

[৬] চারবৎসরের অধিক কাল বিদেশে থেকে যদি বিবির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখি, বা তার ভরণপোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ না করি [বা অন্য কোথাও বাস করি, তবে বিদেশ গমনের দিন থেকে চার বৎসর তিন মাস তেরো দিন উত্তীর্ণ হলে এই বিবাহ কায়েম রক্ষা করা বা না করা বিবির ইচ্ছাধীন থাকবে।

উল্লিখিত শর্ত্তের সমগ্র অংশে সম্মতিদান করে সুস্থ শরীরে এবং সরল মনে এই কাবিননাম লিখে দিলাম। ইতি। সন.........

ইসাদা ইসাদি লেখক

এই দলিল সই করার পর বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। একসময় হিন্দু নারীরাও পর্দ্দা ব্যবহার করতেন। বলা হয় যে এই পর্দ্দা ব্যবহার ইসলামের কাছ থেকে নেওয়া। কিন্তু এদেশে মুসলমান আগমনের আগে থেকেই হিন্দু নারীরা পর্দ্দা ব্যবহার করতেন। অভিজাত বংশের নারীরা কখনই বে-পরদায় বা বে-আব্রু থাকতেন না। অবশ্য এ কঠোরতা নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে ছিল না এবং অর্থনৈতিক কারণে তা সম্ভবও নয় যেমনটি নীচুশ্রেণীর মুসলমান রমণীরা পর্দ্দা ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ইসলামে পর্দ্দা ব্যবহার আবশ্যিক হলেও বর্ত্তমানে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে থেকে পর্দ্দা উঠে যেতে বসেছে।

তালাক শব্দের অর্থ ত্যাগ করা। শরিয়ত নির্দ্দেশিত কয়েকটি কথার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অহমান তালাক হচ্ছে স্ত্রীর দুই ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বা স্ত্রীর সঙ্গে দেহগত মিলন হয় নি এমন স্ত্রীকে এক তালাকে ত্যাগ করা যায়। এতে স্ত্রীর ইজ্জত অটুট থাকে। স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করার পর হায়েজের মধ্যবর্ত্তী তিন পবিত্রকালে তিন তালাক দিলে অথবা নাবালক ও ষাট বৎসরের অধিক বৃদ্ধাকে বা হামেলা স্ত্রীলোককে তিনমাসে তিন তালাক দেওয়াকে হাসান তালাক বলে এবং হায়েজ বা পবিত্রকালের মধ্যে এক সময় এক কথায় তিন তালাক দেওয়াকে বলে বেদায়াৎ। খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরণের তালাক দেওয়া হয় কেননা এ ধরণের তালাককে কেউই পছন্দ করেন না। এ ছাড়া, আর এক ধরণের তালাক আছে—ইসারায় তালাক, তাকে বলে কেনায়া। তিন তালাকের পর কোন স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে। দ্বিতীয় স্বামী তার

সঙ্গে সঙ্গম করার পর তিনি যদি তালাক দেন তবেই প্রথম স্বামী পুনরায় তাকে নিকা করতে পারবেন। সঙ্গমের পূর্ব্বে দ্বিতীয় ব্যক্তি মারা গেলে স্ত্রীকে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কারণ যে পর্য্যন্ত তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী অন্য স্বামীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস না করবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না।

সাঁওতালী ভাষায় বিয়ে হচ্ছে বাপলা। নানাভাবে বাপলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ, বাল্য বিবাহ অপ্রচলিত। ছেলের ১৮-২২ এবং মেয়ের ১৫-১৯ বছর বয়সের আগে বিয়ে প্রায়ই হয় না। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং কম বেশী বয়সী ছেলে-মেয়ের বিয়েও দেখা যায়।

সাঁওতাল বিয়েতে কনে-পণ দিতে হয়। কোথাও কোথাও পণের সঙ্গে দিতে হয় এক বছরের একটি বাছুর। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে উভয় পক্ষকে সাহায্য করেন উভয় পক্ষের বাইবর বা রাইবরিচ। তাঁরা ঘটক। পাকা দেখা অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রীকে কাপড় টাকা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদের টাকা প্রভৃতির সঙ্গে পণ বা চুক্তিবদ্ধ দ্রব্যাদির সম্পর্ক নেই। রীতিসিদ্ধ বিয়েতে বর ও বধূ উভয়ের বাড়ীতেই মণ্ডপ তৈরি হয়। উভয় স্থানেই নাচ গানের ব্যবস্থা থাকে। বিবাহ উপলক্ষে মাদল, করতাল ইত্যাদি সহযোগে তখনই নৃত্যগীত শুরু হয়ে যায় যখন দু'পক্ষের প্রথম সাক্ষাতের পর বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। নাচগান, হাঁড়িয়া, পচাই ছাড়া সাঁওতাল জীবন কল্পনা করা যায় না। বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান কোথাও হয় বরের বাড়ীতে, কোথাও কনের বাড়ীতে। যে বিয়ে কনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় সে বিয়েতে বিয়ের দিন বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে বরযাত্রীর দল টম্ টম্, মাদল, করতাল, বাঁশীসহ কনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এলে শুরু হয় নাচগান। বর ও বরযাত্রীরা গ্রামপ্রান্তের কোনও এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে কন্যাপক্ষের লোকজনেরা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ অগ্রসর হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারপর দুই দল মিলে 'বাহা সেরে এও' গাইতে গাইতে কনের বাড়ী আসে। গ্রামবাসী সকলে স্ব স্ব বাড়ী থেকে গুড় এনে বরকে উপহার দেয়। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় দিনের তৃতীয় প্রহরে। চারজন পুরুষ কনেকে একটি বাঁশের মাচার উপর বসিয়ে গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তায় নিয়ে আসে। অন্য দিক দিয়ে বরযাত্রীদের আস্তানা থেকে কন্যা-পক্ষীয় একজন লোক বরকে কাঁধে তুলে কনের সম্মুখে হাজির করে।

কনে বাঁশের মাচার উপর এবং বর কাঁধের উপর থেকে উভয়ে উভয়ের শির ও কপালে তিন তিনবার সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি ওঠে। নাচ-গান জমে ওঠে। সিঁদুর দান হয়ে গেলেই বিয়ে বা বাপলা সমাপ্ত হয়।

নিষিদ্ধ বিবাহ ব্যাপারে মগমাঝির মতামতই চূড়ান্ত। মগমাঝিসহ বরপক্ষ কনের পিত্রালয়ে এসে দেনাপাওনা ও বিয়ের দিন ঠিক করে। এটা ঠিক হবার দিন থেকেই কন্যা হয় বাগ্‌দত্তা। একটি অনুষ্ঠানে কন্যাকে বরের কোলের উপর বসান হয়। অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করতে বর কনেকে হাঁসুলি বা কিছু দ্রব্য উপহার দেয়। বিয়ের আগেই কন্যাপণ ও গ্রামমান্য মিটিয়ে দিতে হয়।

টুঙ্কিদিপিল বাপলায়ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পাকাদেখা আশীর্বাদ প্রভৃতির দরকার হয়। এ বিবাহ কনের পিত্রালয়ে হয় না, কন্যাপণাদি মিটিয়ে দেবার পর পাত্রপক্ষের লোকেরা গ্রামের মগমাঝিসহ আসেন কনের পিত্রালয়ে। সেখান থেকে তারা কনেকে তুলে নিয়ে যান বরের বাড়ীতে।

পাত্র-পাত্রী নিজেরাও সঙ্গী নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিবাহে যেখানে কনেপক্ষীয়দের আপত্তি থাকে সেখানে গোলযোগ দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে পাত্র হাটে-বাজারে বা কোন সুবিধা মত স্থান থেকে পাত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় ও তার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে হাত ধরে টান দিতে পারলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যায়। তখন কন্যা না চাইলেও তাকে বরের সঙ্গে ঘর করতেই হয়। সিঁদুর-ঘসা মেয়েকে সাঁওতাল সমাজে কেউ বিয়ে করে না। এ বিয়ে হচ্ছে অরই তুৎ বাপলা। অরই তুৎ বাপলা নিয়ে যাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কোন বিবাদ না হয় তা লক্ষ্য করেন বরের গ্রামের মগমাঝি। অনেক সময় কন্যার পিতার লোকেরা বরের ঘরে চড়াও হয়ে তাকে মারধোর করে জোর করে কন্যা দখলের অপরাধে। মগমাঝি উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাট করে দেন। এজন্যও বরকে ভোজ দিতে হয়, দিতে হয় কন্যাপণও। কন্যাপণ নির্দিষ্ট করে দেন গ্রামের মগমাঝি অথবা পঞ্চায়েতের সদস্যগণ।

আর একরকম বিয়ে হচ্ছে ঞিরবল বাপলা। এ বিবাহে মেয়ে নিজে বা মেয়ের কোন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পাত্রের বা পাত্রপক্ষের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তাতে ছেলে রাজী না হলে মেয়েটি বরের গ্রামের মগমাঝিকে তা জানালে মগমাঝি কনেকে সোজা পাত্রের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে বলে এবং কনে বরের ঘরে

চলে এসে গৃহস্থালীর কাজকর্ম আরম্ভ করে দেয়। এমতাবস্থায় অনিচ্ছুক পাত্র ও তার পরিবারস্থ বা গ্রামের লোকজনও মেয়েটির উপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। সমস্ত অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করে যদি মেয়েটি টিঁকে থাকতে পারে অন্ততঃ সাত থেকে পনেরো দিন তাহলে অনিচ্ছুক পাত্রকেই বিয়ে করতে হয়। ঘরজবাঁয় বাপলায় কনে-পণ লাগে না। এ বিবাহে বর বিবাহান্তে শ্বশুরবাড়ী চলে আসে। ঘরদিয়াওয়াল বাপলায় বা ঘরদিজবাঁয় বাপলায় বরকে অন্ততঃ পাঁচ বছর শ্বশুর বাড়ীতে বেগার খাটতে হয়। কনে-পণের বদলে শ্রমদান করতে হয়। তাই এ বিয়েতেও কন্যাপণ লাগে না। এ বিয়ে ঘরজামাই বিয়ে। পাঁচ বছর বাদে শ্বশুর উপযুক্ত উপঢৌকন ও তৈজসপত্র দিয়ে তাকে মেয়ে দান করে।

সাঁওতাল কন্যা প্রথমে শ্বশুরালয়ে আসার পর তাকে কলসী মাথায় নিকট-বর্ত্তী কোন জলাশয়ে যেতে হয় জল আনতে। বর তীর-ধনুসহ তাকে অনুসরণ করে। মাথায় জলভর্ত্তি কলসীসহ বধূ গৃহাভিমুখী হলে বর পিছন থেকে বধূর দুই কাঁধের মধ্যে হাত গলিয়ে সামনের দিকে একটা তীর ছোঁড়ে। তীরটা যেখানে গিয়ে পড়ে কনে সেখান থেকে পা দিয়ে তা বরের হাতে ফেরৎ দেয়। এর তাৎপর্য্য হোল বধূ সর্বদা স্বামীকে সাহায্য করতে এবং সাংসারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম। আর কনের যাত্রা পথে তীর নিক্ষেপ করে বর বোঝাতে চায় যে সে বধূকে যে কোন প্রকার বিঘ্ন ও আপদ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

মুণ্ডাদের বিবাহ অনেকটাই সাঁওতাল প্রথা পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাল্য-বিবাহ অপ্রচলিত নয় তবে বয়সসীমা মোটামুটিভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬-২০ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১-২৮ বছর। স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। নানা গোত্রের মধ্যে চানডিল (নক্ষত্র), কুজুয় (বৃক্ষ), লাক্রা (বাঘ), কাঁকডা, ভক্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বগোত্র নিষিদ্ধ হলেও এরকম বিয়ে যে বর্ত্তমানে হয় না, এমন নয়। এ ধরনের বিবাহকে বলে দুঃখাদুখী; ছেলে মেয়ের ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে, রাজীখুসী বিয়া। করম বা যাত্রা উপলক্ষে দুজনে নাচতে নাচতে তাদের মধ্যে প্রেম ভালবাসার সঞ্চার হয়। ঢুকুরিয়া হচ্ছে যে মেয়ে তার পছন্দমত বরের ঘরে জোর করে ঢুকে গৃহস্থালীর কাজ করতে শুরু করে দেয় এবং অনেক নির্য্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করেও যদি মেয়ে গৃহত্যাগ না করে, তখন সে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুণ্ডা ছেলেরা লাঙ্গল চালাতে না পারলে বিবাহের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। যুবতীকেও পারদর্শী হতে হয় চাটাই বুনতে। সমাজ স্বীকৃত বিয়েতে বর এবং কনেপক্ষের সম্বন্ধ ঠিক করেন দূতম (ঘটক)। তাঁর

মারফৎ কনে দেখার দিন স্থির হয়। কনে দেখার দিন বরপক্ষের লোক যদি পথে অশুভ কিছু (চেঁড়ে-উনি) অর্থাৎ কেউ কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে, কেউ কোদাল বা শাবল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বা গরু অকারণে ডাকছে তাহলে সে কুড়ী (কন্যা)-কে দেখতে যাওয়া হয় না। আর শুভ লক্ষণ হচ্ছে গাই-বাছুর পরস্পরকে ডাকছে, বাঁদিক থেকে ডানদিকে শিয়াল যাচ্ছে বা কেউ ধানচাল নিয়ে যাচ্ছে বা জোয়ালে গরু জোড়া হচ্ছে ইত্যাদি। বরপক্ষীয় দূতমকে কন্যাপক্ষীয় দূতমকে বলতে হয় পথে কি কি শুভ লক্ষণ দেখেছে এবং সেই শুনে যদি কন্যাপক্ষের দূতম লাঠি, ছাতা গুছিয়ে রাখেন তবেই বুঝতে হবে কন্যাপক্ষের সম্মতি আছে, ঠিক অনুরূপ করা হয় বরপক্ষের বাড়ীতে। তারপর উভয়পক্ষের লোকেরা মিলে হাঁড়িয়া বা ইলি পান করে। বিয়ের আগে বর ও কনে উভয়ের বাড়ীতে মাড়োয়া (মণ্ডপ) তৈরি করা হয়। এই মণ্ডপের চারদিকে থাকে চারটি শালগাছ। মাঝখানে কলার ভেলা এবং বাঁশ একসঙ্গে পুঁতে দেওয়া হয়। মণ্ডপে বসিয়ে পাত্র পাত্রীকে এবং নিজ নিজ বাড়ীতে তেল হলুদ মাখানো হয় বিবাহের একদিন আগে; একে বলা হয় সমাংগোসা। তারপর হয় চুমন উৎসব। এই উৎসবে বর ও কনে হলুদরঙে ছাপানো কাপড় পরে বসেন এবং আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপড়শীর মেয়েরা তাদের চুম্বন করে। বর বিয়ে করতে বার হলে হয় উলিসাখি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে একটি আমগাছের গুঁড়িতে বর কিছু সুতো জড়িয়ে দিলে সেখানে পিটুলী দিয়ে দাগ কাটা হয়। পরে বরের মা সেই গাছতলায় ছেলেকে (বরকে) কোলে নিয়ে বসেন এবং আমগাছের পাতা ও গুড় চিবিয়ে বর মাকে তা খেতে দেয়। কনের বাড়ী পৌঁছালে কন্যাপক্ষের মেয়েরা ঘটিতে জল নিয়ে এসে আমপাতায় করে বরের মাথায় ছিটিয়ে দেয়। এরপর বরকে নিয়ে যাওয়া হয় জোলেমে বা অন্য জায়গায়। বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত বর ওখানেই থাকে। পরদিন বরকে আনা হয় বিবাহস্থানে, কনেকে একটি ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে তিনবার বরকে প্রদক্ষিণ করার পর বর ও কনে পরস্পর পরস্পরের দিকে আতপ চাল ছিটিয়ে দেয় এবং একটি আমগাছ (উলিদারু)কে প্রদক্ষিণ করার পর দুই-পক্ষ দু'জনের আঙুলের রক্ত নিয়ে ন্যাকড়াতে মাখিয়ে রাখা হয়। তারপর আবার জোলেমে বর ফিরে যায়। এই ন্যাকড়াকেই বলে সিনাই। বিকেলের দিকে আবার নিয়ে আসা হয় কনের বাড়ী। বর এবং কনেকে তিনবার মণ্ডপ ঘোরানো হয়, তারপর বর নিজের ঘাড়ে সিনাই ছুঁইয়ে কনের গলায় দুবার ছোঁয়ায়।

সেইখানেই হয় সিঁদুর দান অনুষ্ঠান ; এই অনুষ্ঠানে বর ও কনে একে অপরের কপালে সিঁদুর দিয়ে তিনটি দাগ কাটে। পরে বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কনের শাড়ীর আঁচলে গিঁট বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর হয় দা-আউ ও তুরিং এতেল অনুষ্ঠান। এটা তুকতাক বা ম্যাজিক জাতীয় ব্যাপার। স্নানান্তে বরকে একটি তলোয়ার দিয়ে এক কোপে খাসি কাটতে দেওয়া হয় তার শক্তির পরীক্ষা দেখার জন্য। এই খাসি দিয়ে হয় ভোজ। বর ও কনে একত্রে সকলকে খাইয়ে তারপর নিজেরা খায়। এইভাবেই শেষ হয় বিবাহ অনুষ্ঠান।

সাঁওতাল সমাজের মত মহালী সম্প্রদায়ের বিবাহকেও বলে বাপলা। যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে সাধারণতঃ বিয়ে হয় না তবে বাল্যবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল তা বলা যায় না। বিবাহে কনে-পণ দিতে হয়। সাধারণভাবে মহালী পাত্রের বয়স ২০-২৪ এবং পাত্রীর বয়স ১৫-২০ বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁদের গোত্র বা টোটেম বা গোত্র দেবতা হচ্ছে—হাঁসদা [হাঁস], মুরমু [নীলগাই], হেমরম [সুপারী], কিসকু [শঙ্খচিল], মাণ্ডি [বুনো ঘাস] প্রভৃতি। রীতিসিদ্ধ বিবাহে পিতামাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সগোত্র বা জাতি বিবাহ হতে পারে না। সাধারণতঃ মাহালীরা একটি বিয়ে করে থাকে তবে বহু বিবাহ অপ্রচলিত নয়। বড় ভাইয়ের বিধবাকে ছোট ভাই অনায়াসে বিবাহ করতে পারে কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছোট ভাইয়ের বিধবাকে বড় ভাই বিবাহ করতে পারে না। রাজারাজি বাপলা বা হাসিখুসি বিবাহ হচ্ছে প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। টানা বিবাহে মহালী যুবক জোর করে যুবতীর কপালে সিঁদুর ঘসে দিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কনেপণ পরিশোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কনেকে ঘরে নিয়ে আসে। মহালীদের মধ্যেও ঢুকুরিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে অর্থাৎ কনে নিজের মনোনীত বরের ঘরে প্রচুর নির্য্যাতন সহ্য করে যদি টিঁকে থাকতে পারেন অন্ততঃ দু'তিন সপ্তাহ তবে বাধ্য হয়েই ছেলেকে বিবাহ করতে হয়। ঘর জামাই বিবাহও প্রচলিত আছে মহালী সমাজে। বিধবা ও বিচ্ছেদী বিবাহকে বলে সাঙ্গা। আর্থিক কারণে এই বিবাহ মহালী সমাজে সুপ্রচলিত। এই সমাজে বিবাহের বাঁধন খুব আলগা। সমাজের নিয়ম অনুযায়ী বিচ্ছেদী মহিলা স্বামীর দেওয়া লোহার বালা [নোয়া] স্বামীকে ফেরৎ দিলে বিচ্ছেদ ঘটে বা দম্পতির সন্তান না হওয়াও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়।

লোধা পরিবারে অসমবিবাহ প্রচলিত নেই তবে কেউ এ ধরণের বিবাহ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় না। মহালীদের মত বড় ভাইয়ের বিধবাদের

ছোট ভাই বিয়ে করে কিন্তু বড় ভাই তা পারে না। রীতিসিদ্ধ বিবাহে পিতার গুরুত্ব খুব বেশী। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কনেপণ গ্রহণ করে কনের মা, ওটা তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু বদলী বিবাহে কোন পণ দিতে হয় না। প্রণয়ঘটিত বিবাহে কনেপণ দিতে হয়। সাঙ্গাও প্রচলিত আছে এ সমাজে। লোধাদের বিবাহে পানীয় অতি আবশ্যক। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোন নিয়ম নেই। কনে অন্য পুরুষে আসক্ত থাকলে স্বামী তাকে ছেড়ে দেয়। সাধারণভাবে কনে স্বামীকে ছাড়তে পারে না। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে পিতৃগৃহে চলে আসে। পরে অবশ্য তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। তবে এ ব্যাপারে গ্রামপ্রধানের অনুমতি প্রয়োজন হয়। বিবাহ ও সাঙ্গা ছাড়া উপপত্নীও রাখা যেতে পারে তাকে বলা হয় রাখালী বউ। প্রথাসিদ্ধ বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান গায়ে হলুদ, তারপর বিবাহ মণ্ডপ স্থাপন। বিবাহের দিন বর সুশোভিত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কনের পিত্রালয়ে আসে কনেকে নিয়ে যেতে। সেখানে হয় গ্রন্থিবন্ধন ও লোহার বালা পরানো অনুষ্ঠান যাকে খাড়ু পরানু বলে। এইভাবেই হয় তাঁদের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের শুরু।

ঘেড়িয়া সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। গোত্রপদ্ধতি অনেকটাই সাঁওতালদের মত। এঁদেরও স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। অসম বিবাহ সমাজ স্বীকৃত নয়, তবে অপ্রচলিত নয়। কনেপণ প্রচলিত প্রথা। সাধারণতঃ ঘটক মারফৎ বিবাহের প্রস্তাব আসে। কনেপণ নির্দ্ধারণের জন্য উভয় পক্ষ উভয়ের বাড়ী যান। সেখানে হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত থাকে। কনেপণ নির্দ্ধারিত হলে বরের পিতা একটি বাঁশের ছোট লাঠি কনের পিতার বাড়ীতে পোঁছে দেন। এর নাম লাউড়ি। কনের পিতার কাছে এই লাউড়ি পোঁছে গেলেই বিবাহের বাজনা বেজে উঠে। লাউড়ির মধ্যে অবস্থান করেন গৃহদেবতা। কনের পিতা দু'তিন দিন লাউড়ি নিজের বাড়ীতে রেখে আবার ছেলের বাড়ীতে ফেরৎ পাঠান। পাঠানোর অর্থই হোল বিবাহে সম্মতি দান। বিবাহ হয় বরের বাড়ী। বিয়ের আগের দিন কন্যা সদলবলে বরের বাড়ীতে এসে ওঠেন। কন্যাপক্ষকে হাঁড়িয়া ও নাচগানের মাধ্যমে সম্বর্দ্ধিত করা হয়ে থাকে। বর ও কনে পিঁড়ির উপর দু'জনে পাশাপাশি বসলে পুরোহিত বা গণকঠাকুর কনের কপালের মাঝামাঝি জায়গা থেকে একগুচ্ছ চুল টেনে সামনে নামিয়ে দিয়ে তেল ঢেলে দেন। সেই তেল যদি নাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামে তাহলে বুঝতে হবে দম্পতির ভাগ্য বিপর্য্যয়

অনিবার্য্য। সে সব কাটানোর জন্য তুকতাকের প্রয়োজন হয়। তারপর বর ও কনে উভয়ে উভয়ের কপালে সিঁদুর দান করলে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরোহিত নব দম্পতির মঙ্গলকামনান্তে গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা সমাপ্ত করে তাদের হাত ধরে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দেন এবং সেই ধারাই এখনও চলে আসছে।

ওঁরাও বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। গোত্রগুলির নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নাম থেকে। যেমন, বান্দ্রা [বানর], বাখলা [ঘাস], বারলা [বটগাছ], রেজী ধানওয়ার [বিশেষ ধান], ইঁদুর, কাক, কারকত [কাঁকড়া], কটাক [বনবিড়ালী], খয়া [খরগোস], খাজর [কচু], খালযো [মাছ], কিসপূডা [শূকরের লেজ], কুজুর [ফল], লাকরা [বাঘ], নাগ [সাপ] ইত্যাদি। সাধারণ বিবাহ অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে আগুয়া (ঘটক)। গোরধুই অনুষ্ঠান হোল উভয় পক্ষের অবিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের পা ধোয়ানো। বিয়ের আগের দিন উভয় পক্ষের পিতা গ্রামদেবতার পূজা দেন। এই পূজাকে বলে মাড়ুয়া। বিয়ে করতে যাবার আগে পাত্রকে বসতে হয় মায়ের কোলে। সিঁদুর দান হলেই ওঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এখানেও হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত থাকে। এই প্রথাগত বিবাহ ছাড়া প্রণয়ঘটিত বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, ঘরজামাই, সাঙ্গা প্রভৃতিরও প্রচলন আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে ছাড়ি।

বাউরীরা বেশীদূরে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজী নন। পাশ্ববর্ত্তী গ্রামে বিবাহ দেবার দিকেই তাঁদের প্রবণতা দেখা যায়। আমদালী অর্থাৎ সাধারণ বিবাহ আর জামদালী হচ্ছে সাঙ্গা; অযোধ্যা টাইপ হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ বিবাহ আর মথুরা টাইপ হচ্ছে প্রণয়ঘটিত। বিবাহ ঠিক হলে বরকে পৈতা পরতে হয়, এই পৈতায় একটি সুপারী বেঁধে দিতে হয়। বিবাহে কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নেই, আছে নানাবিধ স্ত্রীআচার। স্ত্রীআচারান্তে পাত্র পাত্রীর কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয় তারপর হয় মালাবদল এবং ভোজ। লোহার বালা ফেরৎ দিলে হয় বিবাহ বিচ্ছেদ। উভয়ের ইচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটলে কোন পণ ফেরৎ দিতে হয়না তবে বধূর ইচ্ছায় যদি এই বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে কনেপণ ফেরৎ দিতে হয় এবং সেই টাকা নির্দ্ধারিত করেন গ্রামের মোড়ল।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে রাজবংশীরা কশ্যপ গোত্রের লোক বলে পরিচিত। বর্ত্তমানে এই গোত্র বিভাগ বেড়ে যায়। যেমন কাশ্যপ, সাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, গৌতম, সাবর্ণ, কপিল, মৌদগল্য, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। কিন্তু এখনও যাঁরা গোঁড়া

সম্প্রদায় তাঁরা নিজেদের কাশ্যপ গোত্রের লোক বলেই দাবী করেন। তাঁদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ হয়। সাধারণতঃ বিবাহের বয়স পাত্রের ক্ষেত্রে ২০-২২ এবং মেয়ের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বৎসর। কনেপণ প্রচলিত আছে—এই পণ নিয়ে যে বিবাহ হয় তাকে বলা হয় কইন্যা ব্যাচা। বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে দেয় ঘটক বা ঘটকানী আমাও কাডোয়া বা দীনী বুড়ী। অন্য বিবাহ হচ্ছে ফুলবিয়া। এই বিবাহে কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে উপযুক্ত যুবকের বিবাহ হয়। কন্যার বাড়ীতে এসে বরপক্ষ দেনা-পাওনা ঠিক করেন। এদিনে পানসুপারী আদান প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে দরগুয়া বয়াকাটা। গুয়াকাটার তিনদিনের মধ্যে যদি পাত্রীর বাড়ীতে কোন অশুভ ঘটনা ঘটে তবে সে বিবাহ হয় না। কারো মৃত্যু হলে, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অথবা ঘরের চাল বা দেওয়ালের থাম ভেঙে পড়লে তা অশুভ লক্ষণ। অন্যদিকে কোন শুভ ঘটনা ঘটলে সে বিবাহ শুভ হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন পাত্রের বাড়ী থেকে পাত্রীর বাড়ীতে মাছ, ফুল, নতুন কাপড়, শাঁখা প্রভৃতি তত্ত্ব পাঠানো হয় বিবাহের আগের দিন। এদিন বর ও কনের অধিবাস, গ্রামদেবতার কাছে পূজা দেওয়া হয়, তেলহলুদ মেখে বর ও কনেকে স্নান করানো হয় বাড়ী থেকে জলবরণ করে এনে। পূর্ব্বে বিবাহের জন্য সালঙ্কারা কন্যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো বরের ঘরে, পরদিন বর ও কনে একত্রে আসেন পাত্রীর পিত্রালয়ে। এদিন ভোজের আয়োজন থাকে। এ ভোজের নাম দানপারা। দানপারার পর দম্পতি নিজ গৃহে ফিরে আসেন। আসার সময় বৈরাতীরা বরণডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বর ও বধূর সঙ্গে কন্যাপক্ষীয় লোকজন আসেন বরের বাড়ীতে। বরকে কন্যা সাত বার প্রদক্ষিণ করে কলাতলায় এসে খোতিয়ারী বা ফুলমারামারি অনুষ্ঠান। তারপর উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে হয় শুভদৃষ্টি।

রাজবংশীদের মধ্যে পানিছিটা বা পানিসর পণ বিবাহ প্রচলিত আছে। যখন কোন যুবকের কনেপণ দেবার ক্ষমতা থাকে না তখন তিনি তাঁর গুরুজনের মতানুসারে একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রীর গুরুজনকে অনুরোধ করেন যে আমের শাখা দিয়ে তাঁর এবং সেই মেয়েটির মাথায় জল ছিটিয়ে দিতে অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের বিবাহ দিতে। উভয়ে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে এবং পাত্র অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম হলে সেই বিবাহকে আইনানুগ করার জন্য ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যত সন্তান জন্মে তারা জারজ না হলেও পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। এই ভোজানুষ্ঠানেই হয় মালা বদল ও সিঁদুর লেপন। এ বিবাহকে

গান্ধর্ব বিবাহ বলা হয়। যখন কোন স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণে ব্যর্থ হয় তখন স্ত্রী অন্য-পুরুষ গ্রহণ করতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে পূর্ব্ব স্বামীর নাবালক পুত্র স্ত্রীর সঙ্গে থাকে যদিও সে সৎ পিতার সম্পত্তির অধিকারী নয়।

ঘর সোঁধানী বা ঢোকাবিয়ে ঠিক করে পাত্র পাত্রী নিজেরাই। বেশীর ভাগ সময়েই এরূপ বিবাহ আত্মীয় স্বজনের অমতে অনুষ্ঠিত হয়। এই পাত্র পাত্রীরা সাধারণতঃ বিধবা বা বিপত্নীক। পাত্রী বা মাগী এ ক্ষেত্রে মরদের বাড়ী ঢুকে গৃহস্থালীর কাজকর্ম আরম্ভ করে দেয় এবং দু'তিন দিন এইভাবে চলার পর তাঁরা স্বামী স্ত্রী রূপে গৃহীত হন। এই বউকে পাছুয়া আর বরকে সঙ্গনা বলে। এরা কেউই সমাজে স্বীকৃতি পায় না।

কোচদের মধ্যে পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে নাবালিকা বিবাহ নেই বললেই চলে। কন্যাপণ প্রচলিত প্রথা এবং এঁদেরও বিবাহ হয় বরের বাড়ীতে। কন্যাকে বরের বাড়ী নিয়ে আসা হয়। এ বিবাহে পুরোহিতের দরকার হয় না, দরকার হয় না মাল্য বদলেরও কিন্তু কন্যাকে বর প্রদক্ষিণ করতে হয়। তারপর হয় সিঁদুর দান। পরের দিন হয় ফিরানী অনুষ্ঠান। চুক্তিমত কনেকে সব জিনিষ দেওয়ার পর তবেই বর কনে ঘরে ঢুকতে পারে; এটাই বাসর ঘর। কন্যা যদি নাবালিকা হয়, বরকে বাসর ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ না তিনি সাবালিকা হন এবং এই সময়ে কোনভাবেই কন্যাকে ত্যাগ করা যায় না। বাসর ঘরে সাতটি কড়ি নিয়ে হয় কড়ি খেলা। সারারাত সোহাগবাতি বা প্রদীপ জ্বলে। দু'একদিন বরের বাড়ীতে থাকার পর কন্যা পিত্রালয়ে চলে আসেন এবং ছাওয়া ধুইবার উৎসবান্তে কন্যাকে তাঁর পিতা পাকাপাকিভাবে শ্বশুর বাড়ীতে রেখে দিয়ে যান। এ ধরণের বিবাহ ছাড়া পাছুয়া বা পেতখেত্রী স্ত্রীও কোচেরা গ্রহণ করেন। রাজবংশীদের মধ্যে যত রকমের বিবাহ প্রচলিত আছে কোচেদের মধ্যে তা অনুসৃত। পাছুয়া (পাত+ছুয়া) অথবা এঁটোপাতা আর স্বামীকে বলে ঢোকা ভাতার। ঢোকা শব্দের অর্থ ঠ্যাক বা সাহায্য। যখন কোন বিধবা গোপনে সন্তানসম্ভবা হন, তখন কৃত ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। একে বলা হয় নওগজ বিয়া। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রায়শই হয় এবং বিচ্ছেদী বিবাহে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই কোচ সমাজে।

স্বামী মারা যাবার পর লেপচা নারী দেবর ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না। এর ফলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক। এটাও দেখা গেছে যে স্বামীর বয়স যখন ৪/৫ বছর তখন স্ত্রীর বয়স ৩৫/৪০। দেবর

না থাকলে বিধবা নারীরা অন্যত্র বিবাহ করার অনুমতি পায়। লেপচা মেয়েরা সুন্দরী। সাধারণ বিবাহে পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে আসেন পিরু (ঘটক)। বিবাহের দিনে কনের বাড়ী আসে বর। সঙ্গে আনে "জের" বা প্রণামী—পঁচিশখানা থালা, ঘটি ও টাকা। এ ছাড়া শাশুড়ীর জন্য কম্বল, কাপড়, টাকা ও একটি ঘোড়া এবং ভোজের জন্য একটি ষাঁড় তাঁকে নিয়ে আসতে হয়। একে বলে আসুনমদ্যান। বরযাত্রীদের আপ্যায়নে ত্রুটি হলে কন্যাপক্ষকে জরিমানা দিতে হয়। শাশুড়ী বধূর হাতে লোহার বা সোনার বালা পরিয়ে দেন। একে বলে নেওম একডিল বা বউয়ের হাতকড়ি। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রায় হিন্দুদের মত। বিয়ের পর বধূ পিত্রালয়ে কিছুদিন থাকে এবং মিলনের জন্য প্রয়োজন হলে বরকে যাতায়াত করতে হয়। শ্বশুরবাড়ী আসার সময় বউ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে একটি শূকর এবং আধ মণ চি (পানীয়) নিয়ে আসে।

রাভাদের মধ্যে সাধারণতঃ এক স্ত্রী বিবাহই প্রচলিত তবে সঙ্গতিসম্পন্ন রাভারা একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে। পণপ্রথার বিশেষ প্রচলন নেই। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকের মধ্যে কনেপণ প্রচলিত ছিল কিন্তু হিন্দুসংস্পর্শে আসার পর রাভারা বরপণ নিতে আরম্ভ করে। এঁদের মধ্যেও ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বিধবা পত্নীকে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু বড় ভাইদের ছোট ভাইয়ের বিধবা পত্নী গ্রহণে নিষেধ দেখা যায়। রাভাদের মধ্যে দু'টি ভাগ দেখা যায়—গ্রামবাসী এবং বনবাসী। বনবাসীরা বেশী বয়সে বিবাহ করে থাকে কিন্তু গ্রামবাসী রাভারা কম বয়সে বিবাহ করে। বিবাহের উপযুক্ত সময় মাঘ, ফাল্গুন মাস। বনবাসী রাভাদের সমাজে মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হন।

টোটোদের গোত্র তেরটি—দানকু-বে, দানত্র-বে, মাংচাং-বে, নূরে চাং-বে, বোত্থ-বে, বোউদ-বে, পিসুচ্যাং-বে, কাইজি-বে, লেংকাইজি-বে, বোখো-বে, মানত্রো-বে, মাংকু-বে, ত্রিংচারকু-বে। বে অর্থ গোত্র। সাধারণতঃ স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বেও এরা স্নান করতে জানত না। বর্ত্তমানে যুবকেরা হ্যাফপ্যান্ট ও সার্ট এবং মেয়েরা সধবার মত আংহুং, শাঁখার মত বালা ও রূপোর হার পরিধান করে।

কুর্মি মাহাত পাত্র বিয়ে করতে যায় কনের বাড়ী। সঙ্গে নেন একটি হাঁড়ি, দুটি ডালা, লাটাই, সূতো, মেকচুকা, ঘি, হলুদ, বেগুন, বড়ি ছাগললাদরি, সরষের তেল, গুয়াটকা দই, মাছ, গহনা, সিনাই, শাড়ী, কাঁঠালপাতা ইত্যাদি। এদের মধ্যেও আমতলায় 'আসল খাওয়া' অনুষ্ঠান দেখা যায়। এরা আমগাছে পিটুলী

দিয়ে দাগ কেটে কাকনা বাঁধে। কাকনা বাঁধা হলে আমের ভেঁপ্ পাত্র চিবিয়ে খায়। একে বলে ভেঁপুর থুথু। আরো কতগুলি অনুষ্ঠান পালন করে যা নাকি ভূতপ্রেত তাড়াবার অনুষ্ঠান। বিবাহে আকন্দফুলের মালা ব্যবহার করা হয়। ঐ মালা দিয়েই হয় মালাবদল অনুষ্ঠান এবং সিঁদুর লেপনের পরই সকলে হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বিবাহকে সার্থক করে তোলে।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন প্লাওসিন, প্লাইস্টোসিন, প্রত্নপলীয়, প্রস্তর বা নবপলীয় এবং তাম্রাশ্ম এবং এই যুগানুযায়ী মানুষ পর্য্যায়ক্রমে সভ্যতার শিখরে উন্নীত হয়। যুগগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম যুগে অর্থাৎ প্লাওসিন যুগে পৃথিবীর বুকে মানবজাতির সৃষ্টি হয় নি। তবে ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তখন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল। কেননা শিবলিক গিরিমালা, জাভা এবং চুংকিউ (চীন) এই তিনটি দেশ নিয়ে যদি একটি ত্রিভুজ গঠন করা যায় তবে বাংলাদেশ ছিল তার কেন্দ্রস্থল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্লাইস্টোসিন যুগে মানুষ পাথরের ব্যবহার শেখে এবং পাথরের অস্ত্র তৈরি করে পশুশিকার করত বলে অনুমান করা হয়। আরও উন্নতস্তরে প্রত্নপলীয় যুগের ব্যবহৃত অস্ত্র বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া গেছে। পাথরের নবীকরণ যুগের ঘটনা ঘটে চতুর্থ যুগে অর্থাৎ প্রস্তর বা নবপলীয় যুগে। এইযুগে মানুষ উন্নত ধরণের পাথরের ফলা তৈরি করে শিকার করা ছাড়াও, মাটি কর্ষণ করে চাষযোগ্য ভূমি করে তোলে এবং আগুনের ব্যবহার শেখে। সুতরাং খাদ্য সংগ্রহের দশা থেকে খাদ্য উৎপাদনের পর্য্যায়ে উত্তরণ নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ঘটনা। গর্ডন চাইল্ডের মতে, প্রত্নতত্ত্ব যুগ থেকেই উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সূত্রপাত ঘটেছে। এই সময় থেকেই ভূমির উদ্বৃত্ত ব্যবহৃত হতে থাকে কয়েকটি অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বারা যারা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এই শ্রেণীগুলি ছিল কারিগর, পুরোহিত, পরিচালক, বণিক প্রভৃতি যাদের হাতে সামাজিক উদ্বৃত্তের অনেকাংশ চলে এসেছিলই যা থেকে এবং এই নগর ও নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। আবার, অধ্যাপক জর্জ টমসন দেখিয়েছেন যে পশুপালনজীবী ও কৃষিজীবীর উপরের স্তরগুলিতে কারিগরী, স্থায়ী বাসস্থান ও ধাতুর ব্যবহার বেড়ে যায়, উৎপাদনে উদ্বৃত্ত এবং সুবিধাবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ফলে গ্রাম্যজীবনে ভাঙন ধরে, নগরজীবনের সূত্রপাত ও রাষ্ট্রশক্তির লক্ষণগুলি দেখা যায়।

বাংলাকে সঠিকভাবে জানতে হলে আগে তার গ্রামকে জানার প্রয়োজন, কেননা, নবপলীয় যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি বাঙালী জীবন প্রধানতঃ গ্রাম-কেন্দ্রিক এবং বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ। কারণ হিসাবে

বলা যায় যে বাঙালী জীবন ভূমি ও কৃষিনির্ভর। কৃষিকে নির্ভর করেই তাদের জীবন ও জীবিকা।

নবপলীয় যুগের পর আসে তাম্রাশ্ম যুগ এবং এই যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলে। তামার ব্যবহারই তাম্রাশ্মযুগের প্রধান ভূমিকা। তামার সবচেয়ে বড় খনি ছিল বাংলাদেশে। তাই বাঙালী নিজেদের প্রয়োজনে বা ধনোৎপাদনের এবং উন্নত ধরণের জীবিকা লাভের আশায় খুব স্বাভাবিক কারণে তামা নিয়ে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করে দেয়। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যখন হিন্দু সংস্কার বিরোধী ছিল তখন থেকেই কিছু বাঙালী সমাজের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ডিঙিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল এবং তাদের সাফল্যজনক ব্যবসা ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল। তাম্রলিপ্ত তখন বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর। এই বাণিজ্যের মাধ্যমেই বাঙালী অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানকার সভ্যতার প্রথম আলোকে তামার ব্যবহার। সিন্ধুসভ্যতা, সুমের সভ্যতা এবং মিশরের সভ্যতায় তামার প্রচলন দেখা যায় অর্থাৎ তামা নিয়েই সভ্যতার সূত্রপাত। বাংলাদেশে যে সময় তামার ব্যবহার লক্ষ্য করি, ঠিক সেই সময় মিশর, সুমের এবং সিন্ধু উপত্যকায় তামার প্রচলন ছিল। সুতরাং এ কথা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে ঐ সমস্ত দেশের সভ্যতার সঙ্গে বাংলাদেশের সভ্যতার একটা যোগসূত্র ছিল, এমনকি এ কথাও বলতে আপত্তি নেই যে সিন্ধু সভ্যতা কি সুমের সভ্যতাকে আমরা সভ্যতার প্রাচীন নজীর হিসাবে তুলে ধরলেও বাংলার সভ্যতা যে তাদের চেয়ে কম প্রাচীন নয়, তা কতকগুলি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। যেমন একই সঙ্গে তামার প্রচলন ছাড়াও মাতৃপূজার মাধ্যমে তিন দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাম্রাশ্ম যুগে মাতৃদেবীকে কুমারী হিসাবে কল্পনা করা হয় বটে কিন্তু তাঁর ভর্ত্তা ছিল। মাতৃদেবীর বাহন হচ্ছে সিংহ এবং তাঁর ভর্ত্তার বাহন হোল বৃষ। নারীসুলভ কার্য্যাদি ছাড়াও মাতৃদেবী যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হতেন। সুমেরে তাঁকে যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী বলা হোত। পুরাণে দেবতারা অসুরদের হাতে .পরাজিত হয়ে মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হয়ে অসুরদের নিধন করার ঘটনা আমাদের অসীমশক্তিশালিনী অসুরনিধনকারিণী জগত্তারিণী দেবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কৃষিকার্য্যই যখন গ্রাম্যজীবনের প্রধান জীবিকা তখন বিশেষ করে এবং খুব সঙ্গতঃ কারণেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চলে গ্রাম্য-জীবন গড়ে উঠে। কৃষির মধ্যে মূলতঃ উৎপন্ন বস্তু হোল ধান। সুতরাং সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমকাল থেকেই বাঙালীদের আহার্য্যবস্তু যে ভাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমি কর্ষণ করে তাতে ধান উৎপন্ন করে তাদের অন্যতম খাদ্যের সংস্থান গ্রাম বাংলার মানুষ সহজেই আয়ত্ব করে নিয়েছিল। আনুষঙ্গিক খাদ্যের মধ্যে মাছ প্রধান। নদী-খাল-বিল-বহুল বাংলাদেশে মাছ অতি সহজলভ্য। মাংসের প্রতি বিরাগ বাঙালীর কোনদিনই ছিল না। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতক নাগাদ প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার চেষ্টা হলেও বিষ্ণুপুরাণ ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণগ্রন্থ কর্তৃক সমর্থিত। তাদের মতে উৎসব ছাড়া মাছ-মাংসের ব্যবহার গর্হিত কাজ ছিল না। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ মতে যে সমস্ত মাছ কাদায় বাস করে বা যাদের মুখ সাপের মত সেগুলি ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না। ভাতের সঙ্গে শাক ও অন্যান্য ভোজ্যবস্তু ছিল। যেমন লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কচু ইত্যাদি ; মধ্যযুগের আগে আলুর ব্যবহার ছিল না। ডালের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডালও আলুর মত মধ্যযুগের আগে ব্যবহৃত হয় নি। মাংসের মধ্যে হরিণ ও ছাগ অত্যন্ত প্রিয় আহার্য্য বস্তু ছিল। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় লোকদের শিকারই ছিল প্রধান বৃত্তি। মদের ব্যবহার সর্ব্বত্র ছিল, তবে ব্রাহ্মণ সমাজে নিষিদ্ধ ছিল।

প্রথম খৃষ্টীয় শতকের তৃতীয় পর্ব্ব থেকে ভূমধ্যীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ফলে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের র্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। যে দেশ ছিল কৃষিনিভর, সেই দেশে রোম সাম্রাজ্যের সোনা আমদানীতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আমরা দুটি শ্রেণীর উল্লেখ দেখতে পাই—১) রাজপুরুষশ্রেণী অর্থাৎ শাসক ও রক্ষক শ্রেণী, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী বা অর্থনৈতিক শ্রেণী। এদের সঙ্গে সমাজের ধনের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা জড়িত। প্রাচীন বাংলার ধনোৎপাদনের তিনটি উপায় ছিল—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষি ভূমি-নির্ভর, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার এবং তার উপর রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃত। সুতরাং কৃষিজাতদ্রব্য কর্ষকরা (কৃষক) উৎপাদন করলেও বণ্টন-ব্যবস্থা ছিল ভূম্যধিকারী এবং রাজা বা রাষ্ট্রের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বণিকদের হাতে এবং শিল্প ছিল শিল্পপতিদের হাতে। ধনোৎপাদনের তিন উপায়

অবলম্বন করে স্বভাবতই বাংলায় তিনটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এবং এ কথা বলা যায় যে বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর অর্থাৎ বিশেষ বর্ণের লোক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করে চলবেন। তবে এর যে ব্যতিক্রম হোত না, এমন নয়। যেমন, ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ ছাড়া রাজকীয় পদ অলংকৃত করতেন, পূজা, ধর্মকর্ম করার জন্য বিনিময়ে রাজার ভূমিদান গ্রহণ করতেন। শিল্পজীবীদের মধ্যে রয়েছেন তক্ষক, সূত্রধর, চিত্রকর ইত্যাদি; কৃষিজীবী যেমন রজক, আভীর, কৃষক এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে তৈলকার, ধীবর, জালিক, শুঁড়ি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচীন পুঁথিপত্রে যে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা একটি কল্পিত সামাজিক আদর্শ, যার বাস্তব অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না; যা ছিল তা হচ্ছে পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজ-নির্দ্দিষ্ট পেশাসহ অসংখ্য জাতি। বৃত্তি বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। আদিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বৃত্তিবর্ণের স্তর ঠিক হয়ে যেত। অর্থাৎ সেই পর্য্যায়ে যে যার বৃত্তি বেছে নিয়েছিল এবং তদনুযায়ী বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে জন্ম লগ্ন থেকেই যে যার বর্ণে চিহ্নিত হয়ে যায়। এইভাবে যে সমাজের সৃষ্টি সে সমাজ দুর্ব্বল হতে বাধ্য। ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্তরে আসীন; তাঁরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করে এসেছেন নিম্নস্তরের মানব-সমাজকে পঙ্গু করে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট রাখতে। অগণিত দরিদ্র সমাজের সামনে কুসংস্কারের ডালি তুলে ধরেছিল। ভাগ্য ছাড়া গতি নেই—একথা তাদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবেশ করেছিল। কৃষি ও ভূমি এবং ভাগ্য-নির্ভর দরিদ্র জাতি নিয়ে যে সমাজ, সে যে দুর্ব্বল সমাজ ইতিহাসের গতিকে ব্যাহত করবে তাতে আর সন্দেহ কি!

প্রাচীন বাংলায় একাধিক কারণে নগর গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমতঃ চাষযোগ্য ভূমি ব্যতিরেকে বাসযোগ্য জমির অসঙ্কুলান। দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তি বিভাগ এবং তৃতীয়তঃ বন্টনব্যবস্থার সুরাহা। এই বন্টনব্যবস্থার সুরাহার জন্য নগরগুলিকে স্থলপথ ও জলপথের সঙ্গমস্থলেই গড়ে উঠতে দেখা যায়। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত নগর-বন্দর তাম্রলিপ্ত। বৃত্তি-বিভাগীয় এজন্য বলছি যে গ্রামে সাধারণতঃ বাস করেন বৃত্তিনির্ভর ব্যক্তিরা—শ্রমিক, ভূমিবান বা ভূমিহীন কৃষক, রজক, নাপিত, তাঁতী ইত্যাদি জাতি। এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছোট, জীবিকাও সীমিত। অন্যদিকে নগরে বাস করেন রাজা, রাজকর্মচারী, সামন্তবর্গ, ধর্ম ও শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ শ্রেণী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি। গ্রামের সভ্যতা

গ্রামীণ, আর নগর সভ্যতা হোল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর সভ্যতা। সুতরাং এই দুই সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন হতে বাধ্য। গ্রাম হোল উৎপাদন কেন্দ্র, আর নগর হোল শাসনকেন্দ্র, ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র তথা বন্টনকেন্দ্র। সুতরাং সুখ-সুবিধা অর্থ-আড়ম্বর সবই নগরবাসীরা ভোগ করে থাকেন। সুখ-সুবিধা আর অর্থ হাতে থাকায় নগরবাসীরা অনেক বেশী শিক্ষিত; গ্রামবাসীরা একেবারেই অবহেলিত। এর পেছনে যুক্তি-তর্ক যাই থাকুক, রাজনৈতিক কারণে তাদের এই পার্থক্যের প্রয়োজন। তাই আজও দুইয়ের পার্থক্য অব্যাহত বরং আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন। চরিত্রগত দুর্বলতার জন্য সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেতাদের নেই।

নৃত্যগীত এবং বাদ্যের প্রচলন লোকায়ত সমাজে ছিল। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ (মুরজ) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বিশেষ কোন ঘটনা—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী, কৃষ্ণের লীলা ইত্যাদির রূপদান করা হোত। অনেক সময় নৃত্যগীতে তদানীন্তন সমাজের চিত্রও ফুটে ওঠে। উচ্চ বা নীচ সকল জাতির মধ্যে নৃত্যের প্রসার ছিল। বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, রামচরিত, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যগীতের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ প্রচুর। দেবদাসী প্রথারও প্রচলন ছিল। এই সমস্ত নাচ-গান সাধারণতঃ উৎসব-অনুষ্ঠানের আসরে হোত। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল একাধারে নিজেদের বা জনগোষ্ঠী বা সমষ্টি বা সমাজের কামনা বাসনা পরিপূরণ, অপরদিকে সামাজিক গোষ্ঠী-জীবনের সংহতি বজায় রাখা। মানুষ কামনার দাস—তার কামনার অন্ত নেই। কামনা চরিতার্থ করার জন্য, ভয়ভীতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য, ধন বা শস্য বৃদ্ধির জন্য সে বরাবরই অর্থাৎ আদিম যুগ থেকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সে অলৌকিক ক্ষমতার শরণাপন্ন হয়ে এসেছে। এই অলৌকিক শক্তির জন্য তাকে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করতে হয়েছে। বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, সেই অমোঘ শক্তি বিভিন্ন দেবদেবী রূপে মানুষের মানসলোকে বিরাজ করছে। তাই রেমণ্ড ফার্থের ভাষায় বলা যায় "'Gods' wisdom is the obverse of man's stupidity and error. (Raymond Firth—Elements of Social Organisation")—অর্থাৎ মানুষের অজ্ঞতাই হচ্ছে ঈশ্বরে জ্ঞান। যে সমাজে মানুষের অজ্ঞতা যত বেশী,

দেবতার বৈচিত্র্য সেখানে তত গভীর। ধর্ম, দেবতা, পূজাপার্ব্বণ, ব্যাপক উৎসব-অনুষ্ঠানই হচ্ছে মানব জীবনের বেদনা ও ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ। বৈদিক যাগযজ্ঞ, পৌরাণিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োগ বা উদ্‌যাপন প্রণালী ভিন্ন হলেও, উদ্দেশ্য সকলের এক। ঈশ্বরই আশ্রয়দাতা—এ ধারণা তাদের বদ্ধমূল। অন্যদিকে উৎসব ও পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে যে মেলা বসে তা কিছুনা কিছু ভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চাঙ্গা করে তোলে। মেলার মাধ্যমে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যাদি বেচাকেনার সুযোগ ঘটে এবং উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে এই অন্ধ সংস্কারের কালো মেঘ কিছুটা অপসারিত হয় সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃতির প্রসার হয় মাত্র শতকরা দশজনের মধ্যে, ফলে সামাজিক দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিভেদের ব্যবধান আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এর ফলে যে দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

অতুল সুর — বাংলা ও বাঙালী
অম্বিকাচরণ গুপ্ত — হুগলী ও দক্ষিণ রাঢ়
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — দেখা হয় নাই
— নদীয়ার পুরাকীর্তি
— বাঁকুড়ার মন্দির
— হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯৭২)
অনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত — ক্যালকাটা হিস্ট্রি
অনুকূল চন্দ্র সেন — বর্দ্ধমান পরিচিতি
অশোক মিত্র — পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (১ম—৪র্থ-খণ্ড)
— ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক
আর. এল. বড়ুয়া — আর্লি হিস্ট্রি অব কামরূপ
আমানুল্লা আমেদ চৌধুরী — কোচবিহার ইতিহাস
অসীম মুখোপাধ্যায় — চব্বিশ পরগণার পুরাকীর্ত্তি
এস. সি. ঘোষাল — হিস্ট্রি অব কোচবিহার
এস. এন. সেন — ক্যালকাটা
কুমুদ মল্লিক — নদীয়া কাহিনী
কালিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য — শান্তিপুর পরিচয়
কামিনীকুমার রায় — বাংলার দেবদেবী ও লোকাচার
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় — বাংলার ভাস্কর্য্য
কালীপদ লাহিড়ী — গৌড় ও পাণ্ডুয়া
কালিদাস দত্ত — পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৪১)
ক্ষিতিমোহন সেন — বাংলার সাধনা
গঙ্গাধর সাঁতরা — টেম্পলস অব মেদিনীপুর
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু — বাংলার লৌকিক দেবতা
গোপাল হালদার — বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ
গৌরহরি মিত্র — বীরভূমের ইতিহাস
চারুচন্দ্র সান্যাল — রাজবংশীস্ অব নর্থ-বেঙ্গল

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — বাংলার পালপার্বণ
চোমং লামা — উত্তরবঙ্গ
জে. ই. গাসট্রেল — মুর্শিদাবাদ
জি. টমসন — ষ্টাডিজ ইন এনসিয়েন্ট গ্রীক সোসাইটি (১৯৪৯)-১
জে. ব্যানার্জ্জী — হাওড়া : ডেসক্রিপসান এণ্ড ট্রাভেল
জে. চট্টোপাধ্যায় — বাংলার কথা
তারাপদ সাঁতরা — বাংলার মন্দির
— হাওড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি
[হাওড়া জেলার লোকউৎসব, হাওড়া ১৩৬৯]
— লেট মিডিয়াভ্যাল টেম্পলস অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল
তরুণদেব ভট্টাচার্য্য — মেদিনীপুর
— বাঁকুড়া
ত্রলোক্যনাথ পাল — মেদিনীপুরের ইতিহাস
দেবকুমার চক্রবর্ত্তী — বীরভ্‌ম জেলার পুরাকীর্ত্তি
দানী. এ. এইচ — মুসলীম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল
দীনেশ চন্দ্র সেন — বৃহৎ বঙ্গ
ধনঞ্জয় দাস মজুমদার — বাংলা ও বাংলার গৌরব
নারায়ণ চৌধুরী — বর্দ্ধমান পরিচিতি
নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী — বীরভ্‌ম বিবরণ
নির্মলচন্দ্র বসু — মানভ্‌ম জেলার মন্দির
নির্মলকুমার ঘোষ — ভারত শিল্প
নগেন্দ্রনাথ বসু — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য — কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
নিখিলনাথ রায় — মুর্শিদাবাদ কাহিনী
নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস
প্রতাপাদিত্য পাল — আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার অব বিষ্ণুপুর
প্রসিত রায়চৌধুরী — বঙ্গ সংস্কৃতি কথা
পূর্ণচন্দ্র মজুমদার — মুর্শিদাবাদ

প্রবোধচন্দ্র সেন — সাম জনপদস অব এনসিয়েন্ট রাঢ়
[আই এইচ, এস, খণ্ড-৮, ১৯৩২]

প্রভাসচন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস

বাসটিড. এইচ. ই — ক্যালকাটা হিস্ট্রি

বিনয় ঘোষ — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি [১ম-৪র্থ খণ্ড]
— বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব
— সুতানটী সমাচার
— বাঙালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাস
— টাউন কলকাতার কড়চা

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য — হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস

বি. রায় — ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস বুক

ভি. জি. চাইল্ড — নিউ লাইট অন দি মোস্ট এনসিয়েন্ট ইস্ট [১৯৬৪]

ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — কোচবিহারের ইতিহাস

মুকুল দে — বীরভূম টেরাকোটাস

ডেভিড ম্যাকাচান — লেট মিডিয়াভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল

যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী — কোচবিহার রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যোগেশ চন্দ্র রায় — পূজা পার্ব্বণ

যোগেশ বসু — মেদিনীপুরের ইতিহাস

যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য — হিন্দু কাস্টমস এণ্ড সেক্টস্

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলার ইতিহাস [১ম-৪র্থ খণ্ড]

রমেশ চন্দ্র মজুমদার — হিস্ট্রি অব বেঙ্গল

রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী — বাংলাদেশের ইতিহাস

রামরঞ্জন দাস — পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্ত্তি

সরসী কুমার সরস্বতী — আর্লি টেরাকোটাস অব বেঙ্গল

সুকুমার সেন — প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী
সুধীর কুমার মিত্র — হুগলী জেলার ইতিহাস [১ম-৩য় খণ্ড]
সুনীল চক্রবর্ত্তী — লোকায়ত বাংলা
এস. সি. ঘোষাল — হিস্ট্রি অব কোচবিহার
সৃজন নাথ মিত্রমুস্তাফী — বীরনগর
শঙ্কর সেনগুপ্ত — বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
— বাংলী জীবনে বিবাহ
শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় — কোচবিহার জেলার পুরাকীর্ত্তি
শিবনাথ শাস্ত্রী — রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — বীরভূম বিবরণ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — প্রাচীন বাংলার গৌরব।
হিতেশ রঞ্জন সান্যাল — বাংলার মন্দির
হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য — হিন্দুদের দেবদেবী

নির্দেশিকা

॥ ক ॥

॥ খ ॥

॥ গ ॥

॥ ভ ॥

॥ ম ॥

॥ য ॥

॥ র ॥

॥ ল ॥

আরো বই

ঘোষ, নির্মলকুমার	**ভারত শিল্প** ॥ সচিত্র, ২য় মুদ্রণ স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা, শিল্পের উপাদান ও প্রয়োগরীতির উপর একই বইয়ে এর চেয়ে মনোজ্ঞ বিবরণ বিরল ও দুর্লভ।	৫৪.০০
” ”	যেশুইট পাদ্রীর আকবরনামা	২০.০০
দাশগুপ্ত, প্রেমময়	বাবরনামা	১৫.০০
ভট্টাচার্য, তরুণদেব	পশ্চিমবঙ্গ দর্শন—বাঁকুড়া	৫০.০০
” ”	—মেদিনীপুর	৩০.০০
হালদার, শিবপ্রসাদ	পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য	৩২.০০
সেন, রণজিৎকুমার	স্মৃতিপটে লেখা	৪০.০০
” ”	বিশ্বমনীষী প্রসঙ্গ	৩৬.০০
দাশগুপ্ত, কুশ	প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা	১০.০০
” ”	প্রাচীন ঈজিয়ান সভ্যতা	১০.০০
” ”	প্রাচীন সুমেরীয় ও অক্কদীয় সভ্যতা	১০.০০
” ”	প্রাচীন সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন সভ্যতা	১০.০০
দাস, প্রফুল্লকুমার	শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও স্মারকলিপি	১০.০০
Santra, Gangadhar	Temples of Midnapur	100.00
দাস, ডঃ রামরঞ্জন	পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি	২০.০০